পুরাতন পঞ্জিকা।

শ্রীজলধর সেন।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

CALCUTTA.

Published by
Gurudash Chatterji,
Bengal Medical Library or Gurudas Library.
201, Cornwallis street.

Printed by S. N. Roy at the Victoria Press.
2, Goabagan street.

উৎসর্গ পত্র।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

করকমলেষু।

কয়েকটি কথা।

প্রথম কথা, পঞ্জিকা কখনও 'পুরাতন' হয় না,—চির দিনই 'নূতন' থাকে; দ্বিতীয় কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক পুরাতন মাল নূতন লেবেলে সজ্জিত হইয়া বিকাইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আমি যদি আমার পুস্তকের নাম "নূতন পঞ্জিকা" রাখিতাম, তাহা হইলে বিশেষ কোন অপরাধ হইত না; কিন্তু আমার এখন দোকান-পাট তুলিবার সময় হইয়াছে—মহাজনের নিকট নিকাশ দিবার দিন ক্রমেই নিকট হইতেছে; এ সময় আর 'পুরাতন' মালের উপর নূতন লেবেল দিতে মন সরিল না।

এই পঞ্জিকার কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য, মানসী প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; 'হিমালয়ের স্মৃতি'র কিয়দংশ বসুমতীর স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া বসুমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূজার উপহারের জন্য যোগ্যতর লেখকগণ কত বহুমূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছেন—আমি এবার "পুরাতন পঞ্জিকা"ই শুনাইব।

সন্তোষ,
১৫ই আশ্বিন
১৩১৬

শ্রীজলধর সেন।

ক্ষুদ্র-গল্প।

শেফালিকার দুঃখ

রামকমল মিত্রের বৃহৎ উদ্যানের এক পার্শ্বে এক অতি ক্ষুদ্র কোণে বহুকালের একটি মৃতবৎ কামিনীবৃক্ষ ছিল। এখন আছে কি না কেমন করিয়া বলিব? সে আজ অনেক দিনের কথা। সেই কামিনী-গাছের ছায়ায় ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে আমার জন্ম। কবে কেমন করিয়া আমার জন্ম হয়, তাহা আমি জানি না; কি সূত্রে কামিনীগাছের ছায়ায় আমার বীজ পতিত হয়, তাহা বলিতে পারি না; কত দিন সেখানে ছিলাম, তাহাও জানি না। এক কথায়, আমার জন্ম ও জন্মভূমির কোন সংবাদই আমার জানা নাই।

একদিন, বোধ হয় বসন্তকালই হইবে, একদিন অপরাহ্নে একদল বালক-বালিকা মিত্রদিগের বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা-দিগের হাস্যতরঙ্গে, তাহাদিগের দৌড়াদৌড়িতে সমস্ত উদ্যান মুখর হইতেছিল। সমস্ত বৃক্ষলতাও যেন সেই আনন্দ-কোলাহলে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতেছিল। আমি ক্ষুদ্র এক প্রান্তে পড়িয়া ছিলাম, বালক-বালিকাগণের উল্লাসধ্বনি আমারও কর্ণে পৌছিতেছিল। ক্রমে শব্দ নিকট হইতে আরম্ভ করিল; শেষে দেখি, দুই তিনটি বালিকা কামিনীবৃক্ষতলে উপস্থিত। একজন কামিনীর একটি শাখা ভাঙ্গিয়া লইল, আর একজন গাছের একটি শাখা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সকলের ছোট একটি মেয়ে গাছের তলায় ঘাস ছিঁড়িতে লাগিল; তাহার ইচ্ছা, কামিনীবৃক্ষের তলাটা পরিষ্কার করে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। আমি তখন বড়ই ক্ষুদ্র, সবে দুই

তিনটী কচি পাতা আমার শরীরে শোভমান। বালিকা আমাকে দেখিয়া সহর্ষে করতালি দিয়া উঠিল এবং সঙ্গী সঙ্গিনীদিগকে ডাকিয়া আমার ন্যায় একটি মহার্ঘ-রত্ন আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া নিজের গৌরব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল। তখন তাহার সেই কচি কচি রাঙ্গা দুইখানি হস্ত, আমার দেহস্পর্শ করিল। সে যে কি স্পর্শ! কি বলিয়া বুঝাইব সেই সুখ-কোমলস্পর্শ? আমরা বৃক্ষজাতি, অমন স্নেহ-পরশনে আমাদের প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হয়, তাহা তোমরা কঠিন মানব, কেমন করিয়া বুঝিবে? সেই বালিকার কর-স্পর্শে আমার প্রত্যেক পরমাণুতে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল;—আমি এক মুহূর্ত্তে আর এক নূতন জীবন পাইলাম। এত দিন সেই কামিনীগাছের ছায়ায় তৃণরাশির মধ্যে আমি আমার অস্তিত্ব লোপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। আজ আমি যে "দশজনের একজন" তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি আমার বৃক্ষজীবনে আজ এই প্রথম মানুষের আদর পাইলাম। বালিকা তখন সেই তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, এবং কি করিয়া আমাকে সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইবে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। শেষে একটি বালকের সাহায্যে আমি সেই মিত্রদিগের উদ্যানের নিভৃত কোণ হইতে উত্তোলিত হইলাম। বালিকা আর বিলম্ব করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আমাকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। তাহাদের বহিঃপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আমার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। পাছে কোন প্রকারে আমার অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে বালিকার পিতা, স্নেহময়ী কন্যার অনুরোধে আমার চারিদিকে বেড়া বাঁধিয়া দিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে, সন্ধ্যায়, বালিকার হস্ত-সিক্ত নির্ম্মল জলে—ততোধিক নির্ম্মল তাহার স্নেহ-বারিতে—আমি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম।

দুই তিন বৎসরেই আমি পুষ্পিত হইলাম—আমি একটি ক্ষুদ্র

শেফালিকা। বালিকার ত্রিদিববাঞ্ছিত মধুর গন্ধে আমোদিত হইয়া, আমি তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহারই নিকট হইতে যে সামান্য একটু সুবাস চুরি করিয়া রাখিতাম, সেইটুকু যথাসময়ে চারিদিকে বিতরণ করিতাম। যখন আমার ফুল ফুটিত, তখন সে ফুলে কাহারও অধিকার ছিল না। অতি প্রত্যুষে বালিকা আসিয়া আমার সমস্ত ফুল কুড়াইয়া লইত। পাছে তাহার কোমল করে বেদনা বোধ হয়, তাই আমি রাত্রি-শেষেই পতনোন্মুখ হইয়া থাকিতাম। আমার শরীর একটু স্পর্শ করিলেই বুঝিতাম, আমার পালিনী আসিয়াছে। অমনি তাহার মস্তকে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতাম। বালিকার কত আনন্দ! আমার আনন্দই কি কম হইত—আমার পুষ্পজীবন সার্থক হইত! তার পর হঠাৎ এক দিন চারুদের বাড়ীতে মহাসমারোহ; বাড়ী, ঘর, দ্বার, পরিষ্কার হইতেছে; লোকজন যাতায়াত করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে নবত বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি সে দিন ভয়ে জড়সড়। ছিলাম এক বৃহৎ উদ্যানের এক ক্ষুদ্র প্রান্তে লোকলোচনের অন্তরালে; সেইখানেই আমার বৃক্ষজীবন শেষ হইত; সেই নিভৃত স্থানেই আমি আমার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অনন্তে লীন হইয়া যাইতাম। চারু তাহা করিতে দিল না। আজ এই লোকসমাগমের মধ্যে পড়িয়া আমি যেন মরিবার মত হইলাম। আজ আর চারুকে দেখি না। বাড়ীতে এত আনন্দ, এত কোলাহল, বালক বালিকারা নূতন নূতন পোষাক পরিধান করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি আর এখন ছোট নই; আমার ছায়ায় অপরাহ্ণ কালে একদল বাজনাদার বসিয়ে গেল; তাহারা সমস্ত অপরাহ্ণটা আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আমার মনে আনন্দ নাই। আমি সে দিন মোটেই চারুর সেই প্রসন্ন মুখ, সেই হাসি দেখিতে পাইলাম না। বাঁশী যখন কত সুন্দর রাগিণী আলাপ

করিতে লাগিল, আমি তখন শুধুই ভাবিতে লাগিলাম, এত লোকসমারোহের মধ্যে পড়িয়া চারু কি আমায় ভুলিয়া গেল! দুই এক দিনের পরিচয় নয়, আজ ৬ বৎসর আমি চারুর খেলার সাথী, ৪।৫ বৎসর আমি চারুকে ফুল যোগাইতেছি; হঠাৎ আজ সে আমাকে ভুলিয়া গেল! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি লোকের কলরবে আমি শান্তি পাইলাম না; একটু ভাবিবার—একটু কাঁদিবারও অবসর পাইলাম না।

পরদিন, ভোর হইতে না হইতেই শানাইওয়ালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন বাজাইতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, কে যেন আজ চলিয়া যাইবে; কাহার বিচ্ছেদযন্ত্রণা এই প্রত্যূষ হইতেই শানাইয়ের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে। একটু বেলা হইলেই দেখিলাম, চারু মহাবাদ্যভাণ্ডের মধ্যে দোলায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। সেই চারু পাষাণে বুক বাঁধিয়া সব ছাড়িয়া কোথায় যায়? আমার দিকে ত সে একবারও চাহিয়া দেখিল না! আজ দীর্ঘ ছয় বৎসরের সম্বন্ধ কি এমন করিয়া ভাঙ্গিতে হয়? আমি যে প্রতিদিন, ভোর হইতে না হইতেই, কত ফুল লইয়া তাহার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর সে আমার কাছে আসিলেই যে তাহার চোখে, কোলে, মাথায়, অঞ্চলে সমস্ত ফুল ঢালিয়া দিতাম; এই কি তাহার প্রতিদান? বাদ্যভাণ্ডের আনন্দে মোহিত হইয়া কি সে আমাকে তুচ্ছ করিয়া গেল? আমার পাশ দিয়াই ত দোলা চলিয়া গেল, তখন কি সে তাহার মধ্য হইতে একটু উঁকি দিয়া আমাকে দেখিতে পারিত না। তার সেই লাল চেলীর বস্ত্রখানির ঘোমটা একটু ফাঁক করিলেই ত দোলায় উঠিবার সময় তাহার সে মুখ দেখিতে পাইতাম! তাহা আর হইল না। বাদ্যের শব্দ ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল। আমার প্রাঙ্গণ হায়! হায়! করিতে লাগিল। আমি দারুণ বেদনায় মস্তক অবনত করিলাম। হায় মানুষের ভালবাসা!

তার পর চারু কতবার গেল, কতবার এলো; কিন্তু আমার দিকে আর সে ফিরিয়াও চায় না। কতদিন দেখি পাল্‌কী হইতে নামিতেছে; কতদিন দেখি সে পাল্‌কী চড়িয়া কোথায় যাইতেছে। আমার সহিয়া গিয়াছে; চারুর অনাদর আমার সহ্য হইয়া গিয়াছে। এখন আর আমি বড় বেশী ফুল দিই না।

অনেক দিন পরে, কত দিন ঠিক বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় চারুর বিবাহের ৪।৫ বৎসর পরে, এক দিন একখানা পাল্‌কী আসিয়া চারুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহার মধ্য হইতে কে যেন এক যুবতী বাহির হইল। বাড়ীর মধ্যে ঘোর কান্না পড়িয়া গেল। এমন কান্না আমি এখন রোজই শুনি। আজ তিন চারি মাস হইতে, এমন দিন যাইতে দেখি নাই, যে দিন এ বাড়ীতে লোক কাঁদে না। কি বলিয়া কাঁদে, তাহারাই জানে। আমার মর্ম্মে শুধু সেই করুণ স্বর আসিয়া আঘাত করে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়, তখনও ভাল করিয়া অন্ধকার হয় নাই, তখন নীল আকাশে দুই একটি তারা উঠিয়াছে; সেই সন্ধ্যার সময় শাদা কাপড় পরা একটি ষোল বৎসরের মেয়ে, আলুলায়িত-কেশা, নিরাভরণা, ধীরে ধীরে আমার তলায় আসিল; ধীরে ধীরে আমার গায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্পর্শেই বুঝিলাম, এ আমার চেনা কেহ; কিন্তু এমন শীতল ত তাহার স্পর্শ নহে, এমন মলিন ত তাহার মুখ নহে, এমন মৃদু ত তাহার পদবিক্ষেপ নহে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম;—দেখিলাম চারু! সে চারু নহে! আজ চার বৎসরের মধ্যে আমার চারুকে একেবারে কে যেন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে! চারুর কান্না দেখিয়া, আমার কান্না পাইল। সেই শীতল অঙ্গের স্পর্শে আমার রস সব শুকাইয়া গেল। চারুর কান্নার স্থল আমি। আমার এখন আর পুষ্প-

সম্পদ্ নাই ;—কার জন্য ফুল ফুটাইব? আর সে সাধ্য কি আছে? আমি যে চারুর হৃদয়ের দারুণ আগুনে প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছি! বাড়ীর কর্ত্তাটী মধ্যে মধ্যে আমাকে কাটিয়া ফেলিতে চান। বোধ হয়, চারুর নিষেধে তা করেন না। আমরা দুই জনে একদিনে মরিব। ওগো! তোমরা আমার জীবনের অবলম্বন বিধবা চারুর মৃত্যুদিনে আমাকে ভুলিও না; আমি যেন সেই দিন চারুকে বুকে করিয়া মরিতে পারি। সে দিনের কত বিলম্ব, ভগবান্!

বিবাহের ফর্দ্দ।

তোমরা কর্ম্মফল মান কি না জানি না, আমি মানি। নতুবা তুমি মা-সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র,—কোন দিন পাঠশালা ছাড়িয়া স্কুলের মুখ দেখ নাই,—কোন দিন গোলদিঘীর উপরের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার সিঁড়িতে পর্য্যন্ত পদার্পণ কর নাই ;—সেই তুমি,—সেই আমাদের গ্রামের উন্‌পাঁজুরে ছোকরা রাধাকিশোর এখন মাসে পাঁচশ সাতশ টাকা রোজগার কর ; আর আমি কিছু কম ১৩ বৎসর—দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া—শরীর মাটি করিয়া—চক্ষু দুইটির মাথা খাইয়া—মস্তিষ্কের পীড়া জন্মাইয়া এই যে একটা নয়, দুইটা নয়, চারিটা পাস দিলাম, আমি এখন ৫০৲ টাকা বেতনের মাষ্টারী করি—দারিদ্র্যের কঠোর করাঘাতে জর্জ্জরিতদেহ—নানাপ্রকার অভাবের তাড়নায় অবসন্ন-হৃদয় হইয়াছি ; ইহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল নয় ত কি ?

মনে করিও না, আমি কাহারও সু-অবস্থা দেখিয়া হিংসায় মরিতেছি। হিংসা করিতেছি না—নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া কাতর হইতেছি ; তাই কর্ম্মফলের কথা বলিতেছি। আমার দুঃখের কথা শুনিবে ?

আমি মাষ্টার ; বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও আমি মাষ্টার। গ্রামের বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসি। আমার পিতা জমিদারের সেরেস্তায় সামান্য কার্য্য করিতেন। সামান্য যে জমাজমি ছিল (এখন তাহাও নাই), তাহাতে সংসার চলিত না, বাবার মাসিক বেতন বার টাকা ও জমির উৎপন্ন শস্যে কোন রকমে—বড়ই কষ্টে সংসার চলিত। এ

অবস্থায় আমার পড়ার খরচ দেওয়া বাবার সাধ্যাতীত ছিল। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, ষোল বৎসর বয়সের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম।

আমাদের গ্রামের তিনটি ছেলে তখন কলিকাতায় একটা মেসে থাকিয়া পড়িতেন; আমি তাঁহাদেরই ভরসায় কলিকাতায় আসিয়াছিলাম —তাঁহারাই ১৫ দিনের জন্য তাঁহাদের মেসে আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই পনর দিন আমি কলিকাতা সহরের কত বড় মানুষের বাড়ীতে যে গিয়াছি, তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। যাঁ'র বাড়ীতে একটা কুকুরের জন্য তিনটা চাকর নিযুক্ত আছে, তাঁর নিকট একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রার্থনা করিয়া অকথ্য গালাগালি খাইয়া ফিরিয়াছি। যাঁ'র বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য মাসে সহস্রাধিক টাকা জলের মত উড়িয়া যায়, যাঁহার দাসদাসীদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নে আমার অভাব মোচন হয়, তাঁহার দ্বার হইতে শুষ্কমুখে ফিরিয়াছি।

পনর দিনের পর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। আমারই মত কষ্ট করিয়া লেখা-পড়া শিখিয়া রমেশ বাবু তখন বড় চাকুরী করিতেন; তিনি একদিন এই নিরাশ্রয় কায়স্থ-সন্তানের দুঃখকাহিনী এবং লেখা-পড়া শিখিবার অটল প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আমার উপর দয়া প্রকাশ করিলেন—আমি মাসিক আট টাকা বেতনে তাঁহার পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। প্রাতঃস্মরণীয়, দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার পাইলাম। এম, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত রমেশ বাবুর বাড়ীতেই গৃহশিক্ষক ছিলাম, মাসিক বেতন পনর টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, এতদ্ব্যতীত তিনি নানা রকমে সাহায্য করিতেন। তিনি বড় চাকুরী করিতেন, আমার পাঠ শেষ হইলে

আমার কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবেন, এ আশ্বাসও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টে আছে মাষ্টারী, আমার এত আশা সহিবে কেন? আমি যেবার এম, এ, পরীক্ষা দিলাম, সেই বৎসরই রমেশ বাবু মারা গেলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

এদিকে, এই পাঁচ বৎসর ঘোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমার পূজনীয় পিতামহাশয়ও সেই বৎসরে স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইলাম সাতশত টাকার দুইখানি খত, ভদ্রাসন ও জমিজমা বন্দকী একখানি সতরশত টাকার রেহিনি তমঃসুক, তিনটি নাবালিকা কন্যাসহ একটী নিঃসহায়া বিধবা ভগিনী, বিধবা মাতা, বৃদ্ধা মাসীমা; আর পাইলাম চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অবিবাহিতা একটি কনিষ্ঠা ভগিনী। পিতা, মাতা ও মাসীমাতার অনুরোধ, আদেশ ও অশ্রুজল উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া একটি পরের মেয়ে এবং তাঁহার ষষ্ঠীর দাসদিগের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাহা হইলেই ষোলকলা পূর্ণ হইত!

উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পাইয়াছি, তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম; স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিরও একটা তালিকা দাখিল করি। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মধ্যে প্রধান হইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিখানি ছাড়পত্র, দ্বিতীয় সম্পত্তি এক রাশি বর্ত্তমানে অনাবশ্যক পুস্তক, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সম্পত্তি ডিসপেপ্সিয়া ও ক্ষীণ-দৃষ্টি। পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর বাড়ীতে বসিয়া জমাখরচ মিলাইয়া আমার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলিলাম। ইহা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের কথা।

বি এ পাসই বল, আর এম্ এ পাসই বল, চাকুরীক্ষেত্রে চাই মুরুব্বীর জোর। যা'র মুরুব্বী নাই, সে যত বড় বিদ্বান্ই হউক

না কেন, বাজারে তাহার দর হইবে না; আর যা'র মুরুব্বী আছে, সে কোন রকমে yes, no বলিতে পারিলে এবং নাম স্বাক্ষর করিতে পারিলেই বড় চাকুরী।—আমার মুরুব্বী নাই, রামচন্দ্র-পুরের জমিদারের সামান্য গোমস্তা স্বর্গীয় রাধানাথ মিত্রের পুত্র হরিদাস মিত্রের এ সংসারে মুরুব্বী নাই। রমেশবাবু যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও না হয় একটু বড়াই করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে তিনিও অসময়ে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে বসিয়া ভাবিলে যদি ঋণ শোধ হইত, যদি সুদের টাকা দেওয়া যাইত, যদি দিনান্ন জুটিত, যদি চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইত, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই ভাবিতাম; কিন্তু এ সংসারে তাহা ত হইবার যো নাই। সুতরাং চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার রাজপথে যে চাকুরী পড়িয়া নাই, তাহা আমি জানিতাম; কিন্তু তাহা বলিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে লাভ কি? কলিকাতা সহরে কতজনের অন্ন মিলিতেছে, আর এম্ এ পাস হরিদাস মিত্রের মুরুব্বী নাই—এই অপরাধে কি তাহার অন্ন মিলিবে না? এই সাহসে বুক বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম।

বাড়ী হইতে আসিবার সময় তেরটি টাকা লইয়া আসিয়াছিলাম—তাহার অধিক আনিতে হইলে ঘটী বাটী বন্ধক দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না।

কলিকাতায় একটা মেসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তারপর কয়েকদিন এ আফিস ও আফিস ঘুরিলাম, দুই চারি জন সাহেবের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম; কেহ বলিলেন No vacancy; কেহবা একটু ভদ্রতা বা একটু উপহাস করিয়া বলিলেন Sorry, no room for a graduate like you. কতকগুলা পাস করিয়াও দেখ্ছি বিপদে পড়িয়াছি;

একদিকে graduate আর একদিকে অনাহার! শেষে স্থির করিলাম, যাঁহারা এই জয়পত্র গলায় বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই দ্বারস্থ হইব। একদিন শিক্ষাবিভাগের বড় কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি দয়া করিলেন,—তাঁহারই দয়ায় ৫০৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী জুটিয়াছে। আজ দুই বৎসর ৫০৲ টাকাই পাইতেছি, শুনিতেছি শীঘ্রই আর দশটি টাকা পাইব। মাসিক ৫০৲ টাকা নাকি একজন এম্ এ পাসের পক্ষে এখনকার দিনে যথেষ্ট। হায় মুরুব্বী!

বেতনের ৫০টি টাকাই বাড়ীতে দিই, একটি ছাত্র পড়াইয়া যে পনর টাকা পাই, তাহাতেই কলিকাতার খরচ এবং মাসে একবার বাড়ী যাওয়ার খরচ কুলাইতে হয়। আমার সহপাঠী বিমলচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা ইংরাজী সাহিত্য পড়াই, তাহারই পারিশ্রমিক মাসিক ১৫৲ টাকা মাত্র।

বিমলচন্দ্রের মাতাপিতা আছেন, ছোট ভাই প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস পড়ে, আমি তাহার ইংরাজী শিক্ষক। বিমলদের অবস্থা ভাল; বিমল এইবার বি, এল্, পরীক্ষা দিয়াছে; এদিকে সে এটর্ণীর বাড়ীতেও বাহির হইতেছে—উদ্দেশ্য উকিল ও এটর্ণী দুইই হইবে। কলিকাতার অনেক লোকের সহিত তাহাদের আত্মীয়তা আছে, পাস করিতে পারিলে পশার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বিমলদিগের পরিবারের মধ্যে কেহ কখন বিলাত যান নাই বা সমুদ্র লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু বিমলের মাতাপিতা আঠারো-আনা সাহেব; বিলাতপ্রত্যাগত বাবুরাও বোধ হয় মিঃ দত্তের সহিত সাহেবীয়ানায় পারিয়া উঠেন না। বাড়ীতে সব সাহেবী কায়দা,—ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে বাবুর্চ্চি, খানসামার পরিবর্ত্তে বেয়ারা, ঝিয়ের পরিবর্ত্তে আয়া; "হ'রে", "রামা" প্রভৃতি শ্রুতিমধুর সম্বোধনে ভৃত্যকে কেহ এ বাড়ীতে ডাকিতে পারে

না; ভৃত্যকে ডাকিতে হইলে হয় ডাকিতে হয় "ব্যায়া", আর না হয় ডাকিতে হয় "বয়"। মিঃ দত্তের সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে "সাহাবকো সেলাম দাও" বলিতে হয়, দত্ত মহাশয় বলিবার যো নাই। বিমলের কনিষ্ঠা ভগিনী ষোড়শবর্ষীয়া শ্রীমতী বেলাসুন্দরীকে ভৃত্যেরা 'দিদিমণি' বলিয়া ডাকিতে পারে না, "মিস্‌বাবা" বলিতে হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ হেন মিঃ দত্তের বাড়ীতে আমি প্রাইভেট টিউটার। পনর টাকা বেতন পাইলে কি হয়, সাহেববাড়ীতে পড়াইতে যাইতে হয়, সুতরাং পোষাকের প্রতি অবস্থার অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। খরচা পোষায় না, কিন্তু কি করি বল!

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মাষ্টার দত্তকে পড়াইতে যাই। প্রথম প্রথম কয়েক দিন বেশ গেল, পড়িবার ঘরে কোন গণ্ডগোল নাই; ছেলেটিকে পড়াই, পড়া শেষ হইলে বাসায় চলিয়া যাই; কিন্তু ক্রমে আর একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিলেন—ইনি ভৃত্যদিগের 'মিস্‌বাবা' কুমারী বেলা। ইনি কয়েক বৎসর বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন, কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই; প্রবেশিকার শ্রেণী হইতেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এখন নাকি বাড়ীতে বসিয়া পড়েন, গান বাজনা শিখেন, ছবি আঁকেন; আর কি করেন—না করেন, তাহার খোঁজ ১৫ টাকা বেতনের প্রাইভেট টিউ-টার কেমন করিয়া জানিবেন। এই কুমারী বেলা ক্রমে ক্রমে আমার 'ফাউ' ছাত্রী হইলেন। মাষ্টার দত্তকে পড়াই; তাহার 'ফাউ' স্বরূপ মিস দত্তকে আজ এ কবিতাটার অর্থ বলিয়া দিই, কা'ল ও কবিতার parallel passage বলিয়া দিই, পরশু শেলীর কাব্যের সমালোচনা করি। কর্ম্মভোগ মন্দ নহে! এই ভাবেই দিন যায়। মিস বেলা নাকি মাষ্টার মহাশয়কে খুব like করেন। আমার সৌভাগ্য!

ইতোমধ্যে একদিন বিমল আমাদের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন আমার ছাত্র অমল ও ছাত্রী মিস্ বেলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিমল আসিয়াই বলিলেন "ভাই হরিদাস, আজ আর পড়ান কাজ নাই; তুমি আমার সঙ্গে এসো; একটা দরকার আছে।" আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া পাঠগৃহ ত্যাগ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় বিমলের বৈঠকখানায় বসিতে হইবে; কিন্তু সে আমার হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তার ফুটপাথে উপস্থিত হইল। সম্মুখেই গাড়ী সজ্জিত ছিল, তাহাতে আমাকে লইয়া উঠিয়া কোচম্যান্‌কে বলিল "যাও, ময়দান।"

ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গাড়ীতে বসিয়া বিমল একটি কথাও বলিল না, কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, এ ত বড় বিপদ; দুইটি মানুষ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছি, কথাবার্ত্তা কিছু নাই। এমন করিয়া কি থাকা যায়! আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার মতলবটা কি বল দেখি?" বিমল বলিল "মতলব আর কি!. একটু বেড়াইবার সখ হইল; একেলা বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না, তাই তোমাকে পাকড়াও করিলাম।" আমি বলিলাম "বেশ।" আবার কথা বন্ধ হইল।

গাড়ী এস্‌প্লানেড্ জংসনে উপস্থিত হইলে বিমল বলিল "রোখো।" গাড়ী থামিল, আমরা নামিয়া কর্জ্জন পার্কে বেড়াইতে গেলাম। পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিমল বলিল "এস, এই পাশের ঘাসের উপর হাত-পা ছড়াইয়া বসা যা'ক্।" বড় মানুষের খেয়াল, তাহাই হইল। আবার চুপ। কিন্তু বিমলের ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যেন আমাকে কিছু বলিবে; কিন্তু কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছে না।

আমি তাহার ভাব বুঝিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম "বিমল, তোমার কি

কোন কথা আছে?” বিমল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল “হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে; সেই জন্যই তোমাকে এই নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছি; কিন্তু কথাটা যে কেমন করিয়া আরম্ভ করিব, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না।” আমি বলিলাম “তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি; এখন কথাটা কি বলিয়া ফেল ত!”

তখন বিমল বলিল “দেখ ভাই, আমার ছোট বোন বেলার বিবাহের বয়স হইয়াছে; সমাজের কড়াক্কড় থাকিলে অনেক আগেই তার বিবাহ দিতে হইত; তবে জান কি, আজকা'ল কলিকাতা সহরে ও সব জঞ্জাল বড় একটা নাই। তাই আমরা বেলারও এতদিন বিবাহ দিই নাই। আর তুমিও ত দেখেছ, তা'কে লেখাপড়া শেখাবার জন্য আমরা যত্ন, চেষ্টা, অর্থব্যয়ের ত্রুটী করি নাই। আজকা'লকার শিক্ষিত ছেলেরা যা চায়, বেলাকে তেমনই ভাবেই আমরা শিক্ষা দিয়াছি। সে লেখাপড়াও বেশ জানে, গান বাজনা জানে, নানা রকম শিল্পকর্ম্মও শিখিয়াছে; এ দিকে বেশ নরম সরম—”

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম “তোমার ভগিনীকে আমি প্রত্যহই দেখিতেছি, তাহার রূপ গুণের বর্ণনা আমার নিকট করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এখন আমাকে কি করিতে হইবে তাই বল। একটা ভাল ছেলের সন্ধান করিতে বলিতেছ কি? কিন্তু সে ভারটা আমার উপর না দিয়া অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তির উপর দিলে, ভাল হয় না? আমি ভাই পাড়াগেঁয়ে লোক, তোমাদের কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের রুচির কথা আমি মোটেই জানি না; সুতরাং ঘটকালির ভারটা আর কাহারও উপর দিলে ভাল হয় না?” বিমল বলিল “আরে! তোমাকে ঘটকালি করিতে কে বলিতেছে? আমরা ঘটকী ডাকিয়া বিবাহের সম্বন্ধ করিব না। বর আমি স্থির করিয়াছি, এখন তোমার মত-সাপেক্ষ।”

তোমরা ভগিনীর বিবাহ দিবে, তা'তে আমার মতের প্রয়োজন কি, আর তার মূল্যই বা কি ?"

আমার কথা শেষ না হইতেই বিমল বলিল "এই দেখ ! আমার কথাগুলিই আগে শোনো, তার পর মতের কথা তুলিও। বাবার ও মায়ের ইচ্ছা যে, তোমার সঙ্গে বেলার বিবাহ——।"

আমি। আমার সঙ্গে ! বল কি ? তোমরা কি পাগল হয়েছ, না আমাকেই তোমরা পাগল পেয়েছ ! আমার সঙ্গে,—ভাই বিমল, ঠাট্টা করবার লোক বুঝি আর দুনিয়ায় খুঁজিয়া পাইলে না।"

বিমল। এই দেখ ! আমার কথাটাই শেষ ক'রতে দেও। বাবা ও মায়ের ইচ্ছা যে, তুমি বেলাকে বিয়ে ক'রে বিলাতে যাও, সেখান থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এস। তার পর আরও এক কথা, বেলার এতে খুব মত আছে ; সে এক রকম কথাটা প্রকাশই ক'রেছে। দেখ, এতে তোমার অমত হ'বার কোন কারণ নাই ; এদেশে থেকে, কোন দিনও উন্নতি হবে না। তা'র চাইতে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এলে তোমার নিশ্চয়ই পসার হ'বে ; ততদিনে আমিও একটা এটর্ণীর আফিস খুলে ব'স্‌বো। আর জান ত, কলিকাতায় আমাদের অনেক বড়-মানুষ বন্ধুবান্ধব আছে, পসার হ'তে দেরী হ'বে না। বাবার নিতান্ত ইচ্ছা, বেলারও মত আছে, এখন তুমি মত ক'র্‌লেই আমরা সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে ফেলি। বল, তোমার কি মত !"

আমি ত একেবারে অবাক্। এ ছোঁড়াটা বলে কি ! আমার সঙ্গে বেলার বিবাহ ! দোহাই ধর্ম্মের। এমন কথা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এমন কল্পনাও আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি ৫০৲ টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টার, পনর টাকা উপরি-লাভের লোভে মিঃ দত্তের বাড়ী প্রাইভেট টিউটারী করি ; আমি কিনা মিঃ দত্তের মেয়েকে বিবাহ

করিব! আর সে মেয়েও যে-সে মেয়ে নয়, মিস্ বেলা—চাকরদের "মিস্ বাবা"। এমন কর্ম্ম আমার দ্বারা হইবে না, আমি রামচন্দ্রপুরের হরিদাস মিত্র, এমন কর্ম্ম কখন করিতে পারিব না।

আমাকে নীরব দেখিয়া বিমল বলিল "কি বল, কথা ব'ল্‌ছো না যে! দেখ, বেলা তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে, আমরা তার এবং তোমার মঙ্গলের জন্যই এই প্রস্তাব করিতেছি। তা বেশ, আজই তোমার উত্তর চাই না, আগামী কল্য তুমি উত্তর দিও। এখন ওঠো, পশ্চিম দিকে বড় মেঘ ক'রেছে, হয় ত জল হবে। তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী যাবো, ওঠো।"

গাড়ীতে আর কোন কথাই হইল না; বিমল আমাকে আমার মির্জ্জাপুরের মেসের দ্বারে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি, মিঃ দত্তের ভবিষ্যৎ জামাতা, হাইকোর্টের সুদূর ভবিষ্যতের ব্যারিষ্টার, মেসের ড'াল চচ্চড়ি আহার করিয়া আমার সেই সনাতন কেওড়া-কাঠের তক্তপোষে অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম।

এইবার চিন্তার পালা। মিথ্যা কথা বলিব না, বিমলের প্রস্তাবে যে একটু গৌরব অনুভব করি নাই, তাহা নহে। আমার বয়স ২৩ বৎসর, এম্. এ পাস করিয়াছি, ক্ষীণদৃষ্টির জন্য চসমাও লইয়াছি, চেহারাটাও নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মত নহে, সুতরাং আমি যে একটা মেয়ের নিকট "লভের" পাত্র, এ কথা অস্বীকার করি কেমন করিয়া। কিন্তু তার পরেই অন্ধকার! সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্যই বিমলের প্রস্তাব যে, আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়া বারিষ্টার হইয়া আসি। হয় ত শ্রীমতী বেলাও আমার ভবিষ্যৎ ব্যারিষ্টারমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে, নতুবা ৫০৲ টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে মিস্ বেলার বিবাহ কি সম্ভব? বেশ্ কথা, মিস্ বেলাকে মিসেস্

মিত্র করিলাম, বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়াও আসিলাম; কিন্তু আমার মা, আমার মাসীমা, আমার বিধবা ভগিনী, আমার অবিবাহিতা ভগিনী,—তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং এই বিলাসে পরিবর্দ্ধিতা একটা মেয়েকে জীবন-পথের সঙ্গিনী করিয়া কাটাইতে হইবে! সে কিছুতেই হইতে পারে না। আমি ভালবাসার ধার ধারি না, ৫০৲ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টারের হৃদয়ে কবিত্বের স্থান নাই। এই সাত টাকা মণ চাউলের বাজারে যাহাকে প্রকাণ্ড একটা সংসার প্রতিপালন করিতে হয়, যাহার গলায় একটা অবিবাহিতা ভগিনী, একটি বিধবা ভগিনী ছেলে মেয়ে লইয়া যাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যাহার ভদ্রাসন রেহেনে আবদ্ধ, সে চুরি করিতে পারে, ডাকাতি করিতে পারে, কিন্তু সে "লভ্" করিতে পারে না; "লভের" শাস্ত্রে এ কথা লেখে না। মিস্ বেলা আমার নিকট পড়িতে আসিত, আমি পড়া বলিয়া দিতাম; বাস্, এই খানেই আমার কার্য্য শেষ। 'লভ্' করিবার অবকাশও আমার ছিল না, প্রবৃত্তিও আমার ছিল না; এখনও এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া হঠাৎ আমার প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিবারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অবশ্য, আমি গরিব স্কুল-মাষ্টার, আমার সহস্র অভাব; এ দিকে সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রলোভন; কিন্তু এ সকল কিসের জন্য?—আত্মসুখের জন্য কি এই কাজ করিব? আমার ভাবী শ্বশুরের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তিতে আমার মাতা মাসীমাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে। তাহার পর বিলাত হইতে ফিরিয়া আমি হয় ত মা মাসীর প্রতি কর্ত্তব্যই ভুলিয়া যাইব; বিলাতের বাতাস যে বড় খারাপ। অনেকের মাথা বিগড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছি।

তবে কি এই বিবাহে মত দিব না? অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিলাম, কিন্তু কথাটার মীমাংসা হইল না; তাহার পর নিদ্রা।

বিবাহের ফর্দ্দ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার আবার ঐ চিন্তা, আজ ত বিমলকে জবাব দিতে হইবে। শেষে যাহা স্থির করিলাম, তাহা বলিতেছি। স্থির করিলাম—সে দিন আর পড়াইতে যাইব না; একখানি পত্রে সমস্ত কথা লিখিয়া বিমলদের বাড়ীর দ্বারবানের হস্তে দিয়া আসিব। তাহাই করিলাম। বিমলকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার একখানি নকল রাখিয়াছিলাম; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভাই বিমল, তোমার প্রস্তাবের প্রথমাংশ আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার ভগিনীকে আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমি বিলাত যাইতে পারিব না, ব্যারিষ্টারও হইব না। ইহাতে সম্মত আছ?

বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে বিবাহে একটা দেনা পাওনার ফর্দ্দ হইয়া থাকে। আমার কোন অভিভাবক নাই, সুতরাং ফর্দ্দটা আমিই দিতেছি। আমি এই বিবাহে কি কি চাই এবং কি কি চাই না, তাহারই ফর্দ্দ দিতেছি।

(১) একটি ভাল ছেলে দেখিয়া আমার অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ দিয়া দিতে হইবে; সমস্ত ব্যয়ভার তোমরা বহন করিবে।

(২) আমার পিতার প্রদত্ত সাত শত টাকার হ্যাণ্ডনোট খানি ফিরাইয়া লইতে হইবে, মায় সুদ সমস্ত টাকা তোমাদিগকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) আমার বাড়ীখানি চোদ্দশত টাকার জন্য মর্টগেজ আছে, তাহা ছাড়াইয়া দিতে হইবে।

(৪) তোমার ভগিনীকে কোন অলঙ্কারপত্র, কি বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতে পারিবে না, শাঁখা সাড়ী দিয়া তাহাকে সম্প্রদান করিবে।

(৫) আমাকে কোনপ্রকার যৌতুক দিতে পারিবে না। বরসজ্জা, ঘড়ি চেন ইত্যাদি কিছুই আমি চাহি না।

(৬) তোমার ভগিনী সামান্য গৃহস্থ-বধূর মত আমার গৃহে গমন করিবেন, এবং আমার পল্লী-কুটীরে থাকিয়া আমার মাতা, মাসীমাতা, বিধবা ভগিনী প্রভৃতির সেবা করিবেন।

(৭) তোমার ভগিনীকে তোমরা কোনপ্রকার পকেটমনি দিতে পারিবে না, ৫০৲ টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রীর যাহা প্রয়োজন, তাহা আমি দিতে পারিব।

এই আমার বিবাহের দেনা-পাওনার ফর্দ। তুমি বলিয়াছিলে যে, তোমার ভগিনী আমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন। সত্য সত্যই যদি তিনি আমাকে ভাল বাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ভালবাসার জন্য তিনি এই সামান্য ত্যাগস্বীকার অবশ্যই করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি আমাকে ভাল না বাসিয়া, ভবিষ্যতের মিঃ এইচ, মিত্র ব্যারিষ্টার-এট্-ল-কে ভাল বাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নাচার আছি।

তাহার পর, প্রথম যে তিনটা দফা লিখিয়াছি, তাহা দেওয়া তোমাদের ন্যায় ধনী লোকের পক্ষে অতি সামান্য কথা।

আমার বক্তব্য আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, এখন তোমরা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পার। ইতি—

বিনীত

শ্রীহরিদাস মিত্র।"

আমার এই পত্র পাইয়া মিঃ দত্তের বাড়ীতে কি হইয়াছিল, সে সংবাদ আমি পাই নাই ; কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যার সময় মিঃ দত্তের বাড়ী হইতে একজন বেহারা আসিয়া আমাকে সাতটা টাকা দিয়া বলিয়া গেল যে, পর দিন হইতে আমাকে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না।

বিবাহের ফর্দ্দ।

তাহার পর এই তিন মাস যায়, বিমলের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে কি না জানি না। আমি ২০৲ টাকা বেতনের আর একটা প্রাইভেট টিউটারী পাইয়াছি, সে বাড়ীতে বিলাতী চাল নাই, অবিবাহিতা মেয়েও নাই। আগামী মাস হইতে আমার বেতনও দশ টাকা বাড়িবে।

চিতার আগুন।

আমার নাম শ্রীগোরাচাঁদ দাস মিত্র, পিতার নাম ৺ফকিরচাঁদ মিত্র, পিতামহের নাম ৺দয়ালচাঁদ মিত্র।

তোমরা যে একেবারে হেসেই অস্থির! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? নামগুলি তোমাদের পছন্দসহি হইতেছে না,—কেমন? তা কি ক'র্‌বো বল। তোমাদের কাছে গল্প ব'ল্‌তে হবে ব'লে ত আর বাপের নামটা নবেলী রকম করিতে পারি না। ফকিরচাঁদ, দয়ালচাঁদ নাম যদি তোমাদের মনের মত না হয়, তা হ'লে যাদের বাপের নাম প্রাণবল্লভ, পিতামহের নাম জ্যোৎস্নাকুমার, তাদের কাছে গল্প শুনিতে যাও; আমার গল্প তোমাদের মত লোকের মনের মত হইবে না।

কি ব'ল্‌ছো,—'দাস মিত্র' কথাটায় তোমাদের আপত্তি? তা 'বর্ম্মণ মিত্র' 'শর্ম্মণ মিত্র' যা ইচ্ছা তাই ব'ল্‌তে পার, আমি কিন্তু 'দাস মিত্র'ই বলিব। 'দাস' ব'লে আত্মপরিচয় দিতে যার আপত্তি, সে ইংরাজের মুল্লুক ত্যাগ ক'রে আর কোথাও যাইতে পারে,—আমি দাসত্বের মায়া কাটাইতে পারিব না, তা তোমরা আমার গল্প শোন আর নাই শোন।

নাম জিজ্ঞাসা করিলে পিতৃপিতামহের পরিচয় দিতে হয়। তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে এতকাল পরে আমি কিছুতেই 'জি, মিটার' ব'লে আত্ম-পরিচয় দিতে পার্‌ব না।

গল্প ব'ল্‌বো কি, নাম ব'লেই ত তিন নম্বর কৈফিয়ৎ দিলাম। এমনই ক'রে প্রতি কথায় যদি তোমরা জেরা আরম্ভ কর, তা হ'লে

আমাকে এই স্থানেই বিদায় গ্রহণ ক'রতে হবে। তোমরা হয় ত মনে ক'রেছ যে, আমি যখন বর্ত্তমান নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গল্পারম্ভেই চাঁদের জোছনা, মলয় সমীর, ফুলের সুবাস, লতা-কুঞ্জ প্রভৃতি কিছুরই আমদানি করি নাই, তখন গল্প একেবারেই কিছু না। কিন্তু হে সমজদার পাঠক! সকল জিনসেরই সময় অসময়, পাত্রাপাত্র ভেদ আছে, এ বয়সে "কাব্যি" করা আমার মত গোরাচাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

যাক্ ওসব বাজে কথা। গল্পটাই আরম্ভ করি। আমার নাম গোরাচাঁদ শুনিয়া তোমরা যদি মনে করিয়া থাক যে, আমি কোন জমিদারের নায়েব বা তহশিলদার, অথবা কোন বড়-মানুষের বাজার-সরকার, তাহা হইলে তোমাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার পিতার নাম ফকিরচাঁদ হইলেও তিনি সত্য সত্যই ফকির ছিলেন না। কোন দিন তাঁহাকে চাকুরীর উমেদারী করিতে হয় নাই; পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে নয়টার সময় তাড়াতাড়ি অন্ন উদরস্থ করিয়া তাঁহাকে রুদ্ধশ্বাসে আফিসে হাজিরী দিতে যাইতে হয় নাই। আমাদের গোলাভরা ধান আছে, পুকুরভরা মাছ আছে, দালানে নারায়ণ আছেন, আর বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপা আমার পিসীমা আছেন;—তোমাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে আমাকেও চাকুরী করিয়া খাইতে হয় না।

আমিও যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছি। তোমাদের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় হাত লম্বা ও তিন-পো হাত প্রশস্ত প্রশংসাপত্র আমারও খানদুয়েক আছে। আমিও এককালে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে থাকিয়া তোমাদেরই প্রেসিডেন্সি কলেজে যাতায়াত করিতাম। তবে দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তোমাদের ঐ গোলদিঘীতে বসিয়া চাঁদের জোছনা পান করা, বা তোমাদের কাহারও কাহারও মত বিরহে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করা,—ওসব গ্রহের ফেরে আমাকে পড়িতে হয় নাই; তাই এখন তোমরা দেখিতেছ যে, আমি একেবারে খাঁটি গোরাচাঁদ দাস মিত্র। নির্ব্বিকার চিত্তে বাড়ীতে বসিয়া থাকি, প্রজার নিকট হইতে ধান আদায় করি, খাজানা ওয়াশীল করি, ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তি করি, বাগানে তরি তরকারী জন্মাই, গ্রামের লোককে হোমিওপেথী ঔষধ বিতরণ করি, আর কি করি,—তাহা আমি বলিব না; শেষে তোমরা সংবাদপত্রে সেই সকল কথা লইয়া আন্দোলন কর, আর আমার এই নিভৃত পল্লী নিবাস অশান্তির আবাসস্থল হউক!

আমার বয়স ৩২ বৎসর ৮ মাস। বাড়ীতে কে কে আছেন, তাহার পরিচয় দিতে হইতেছে। প্রথমেই আছেন—গৃহদেবতা নারায়ণ বিগ্রহ; তাহার পর আছেন—গোশালায় ১১টী গোদেবতা; তাহার পর আছেন—নরদেবতা আমার পিতামহের আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য—আমার শ্যামা কাকা, আর আছেন—আমার পিসীমা। আমার একটী ছোট ভগিনী আছেন; তিনি বৎসরের আট মাস আমার ভগিনীপতির বাড়ীতে থাকেন, চারি মাস আমাদের বাড়ীতে থাকেন। আমাদের বাড়ীতে আর কেহ নাই।

নবেলের উপকরণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া বোধ হয় তোমরা নিরাশ হইতেছ; স্ত্রী নাই, অন্ততঃপক্ষে সেই রকম একটা কিছুর সম্ভাবনাও দেখিতে না পাইয়া তোমরা নিরাশ হইও না। আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও নাই, বয়সও নাই। এখন বিবাহের ব্যবস্থা করিলেও তাহার মধ্যে রোমান্সের কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না; সুতরাং সে কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনাভাব।

কিন্তু আমি গোরাচাঁদ মিত্র এম্, এ,—চিরকুমার থাকিব বলিয়া পাঠ্যাবস্থায় কোন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি নাই, এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার

জন্যও এতদিন কুমার-জীবন যাপন করিতেছি না। আমার জীবনেও একদিন বিবাহের ফুল ফুটিয়াছিল; একদিন—কেবল এক দিনের জন্য প্রজাপতি আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন;—তাহার পরেই চিতা-সজ্জা। সেই চিতার অগ্নি এখনও আমার সম্মুখে প্রজ্বলিত রহিয়াছে—আমি এখন সেই অগ্নির উপাসক। সেই কথা বলিবার জন্যই এতক্ষণ বৃথা বাক্যব্যয় করিলাম।

আমি যখন এম্ এ পাস করি, তখন আমার বয়স—২২ বৎসর; সে আজ ১৩ বৎসরের কথা। তখন আমার পিতৃদেব জীবিত ছিলেন, মাতাঠাকুরাণী তাহার অনেক পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

এম্ এ পাসের অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল; কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হইলে বিবাহ করিব না,—এই কথা পিসীমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায়, তিনি কিছু দিন অপেক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পিসীমার কথার উপর আর কাহারও কথা চলে না; সুতরাং বাবাও নিরস্ত হইয়াছিলেন।

পাসের সংবাদ বাহির হইলেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল; আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। বিশেষতঃ পিসীমা যখন তাঁহার ননদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন, তখন কাহার সাধ্য যে, তাহার উপর কথা বলে! মেয়েটি সুন্দরী; তাহার পিতার অবস্থা ভাল; তাহারা কুটুম্ব, এবং তাহাদের বাড়ীও আমাদের বাড়ী হইতে দূরে নহে। এতগুলি শুভ সংযোগের বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথাই ছিল না।

কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল; ১৭ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইল। দুই বাড়ীতেই আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল; বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। যথাসময়ে গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল। অন্য দিনের মত

১০ই বৈশাখ বুধবারও আসিল। অপরাহ্ণকালে বাদ্যভাণ্ড করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম; আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই এই শুভকার্য্যে যোগদান করিলেন।

আমাদের গ্রাম হইতে শেখরনগর তিন মাইল পথ। আমরা দুই ঘণ্টার মধ্যেই শেখরনগরে পৌঁছিলাম। সে দিন পূর্ণিমা। আমরা সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম, তখন একটা প্রকাণ্ড বাগানের পার্শ্ব হইতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছিল; আকাশে মেঘ নাই, চারিদিক্ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

আমাদের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা গ্রামের বড় বড় রাস্তা ঘুরিয়া বসুদিগের প্রকাণ্ড বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বরপক্ষীয়দিগের অভ্যর্থনার জন্য বসু-মহাশয়েরা বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। আমি বরের আসনে উপবিষ্ট হইলাম।

এমন সময় বাড়ীর মধ্য হইতে একজন দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—
"রামা, দৌড়ে যা; ডাক্তার বাবুকে আসতে বল্।"

উপস্থিত সকলে বজ্রাহতবৎ হইলেন। কাহারও মুখে কথা নাই;—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারিতেছেন না। বাড়ীর লোকেরা একবার ভিতরে যাইতেছেন—একবার বাহিরে আসিতেছেন। শেষে জানিতে পারা গেল যে; যাহার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা, তাহার ওলাউঠা হইয়াছে। অপরাহ্নে মেয়েটির দুই তিন বার দাস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেদিকে আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই,—কেহ তত মনোযোগও করে নাই। আমরা যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন মেয়েটির আর একবার দাস্ত হইল; সে আর চলিতে পারিল না। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বিছানায় শয়ন করাইল; তখন ডাক্তারের বাড়ীতে লোক ছুটিল।

চিতার আগুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার আসিলেন; তিনি রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আর আশা নাই—'এসিয়াটিক্ কলেরা!' বাহিরে এই সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। প্রতিবেশী রামরতন মজুমদার মহাশয় তখন আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বরের আসন ত্যাগ করিয়া মজুমদার-বাড়ীতে গমন করিলাম; বরযাত্রগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। তখন সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া অঙ্কিত হইল।

আমি বরবেশ ত্যাগ করিলাম। বিবাহ করিতে আসিয়া এমনভাবে ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া একটু কাতরও হইলাম; কিন্তু উপায় নাই। মজুমদারদিগের বৈঠকখানা-ঘরের সম্মুখেই পথ। আমি একাকী সেই পথে বেড়াইতে লাগিলাম।

একটু পরেই বসুদিগের বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। বুঝিলাম— সকল শেষ হইয়া গেল! আমাদের দলের অনেকেই তখন চলিয়া গেলেন; বাবা আমাকেও বাড়ী যাইতে বলিলেন। কিন্তু সমস্ত দিন অনাহারে আমার শরীর এমন অবসন্ন হইয়াছিল এবং এই ব্যাপারে আমি এমন কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইল। বাবা তখন বলিলেন,—"তবে আজ তুমি এখানেই থাক; কা'ল সকালে পাল্‌কী পাঠাইয়া দিব; তোমাকে লইয়া যাইবে"

বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরেই আমার জন্য শয্যারও ব্যবস্থা হইল। কোথায় বরের শয্যা—না এই বিপদ্! আমার কিছুতেই নিদ্রা হইল না; আমি বিছানায় শয়ন করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রি যখন এগারটা, তখন পল্লী কম্পিত করিয়া ভীষণ শব্দ হইল— "বল হরি, হরিবোল!"

আমি আর বিছানায় থাকিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, সম্মুখেই পথ। একটু পরেই আবার শব্দ হইল,—"বল হরি, হরিবোল!" তাহার পরেই দেখিলাম, বরসজ্জার জন্য যে খাট আনীত হইয়াছিল, সেই খাট কয়েকজন লোকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। যেমন খাট তেমনই আছে, যেমন বিছানা তেমনই আছে। যে খাট দুই দিন পরে ফুলশয্যার জন্য ব্যবহৃত হইত, সে খাটে আজ শ্মশান-শয্যা বিস্তৃত হইয়াছে। আমার সম্মুখ দিয়া শ্মশান-যাত্রীরা চলিয়া গেলেন। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। যাহাকে জীবন-যাত্রার সঙ্গিনী করিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম, সে আমাকে ফেলিয়া আগে মহাযাত্রা করিল,—এই কথা ভাবিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমিও ধীরে ধীরে শ্মশান-যাত্রীদিগের সঙ্গী হইলাম। পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। আমাকে এ অবস্থায় তাহাদের অনুগমন করিতে দেখিয়া দুই চারিজন সরিয়া দাঁড়াইল। আমি নীরবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে পূর্ণিমার রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল,—"বল হরি, হরিবোল!"

গ্রামের অদূরেই নদী। নদীতীরে সকলেই সমাগত হইলেন। খাটখানি নামাইয়া রাখা হইল। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় আমার যিনি শ্বশুর হইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি আমার নিকটে আসিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এস বাবা, একবার দেখে যাও, একবার—"। ভদ্রলোক আর কথা বলিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার তখন গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, আমার শরীর তখন কাঁপিতেছিল।

বসু মহাশয় আমার হাত ধরিয়া খাটের পার্শ্বে লইয়া গেলেন। বহুমূল্য মশারির এক প্রান্ত তুলিয়া ধরিলেন। আমি জন্মের শোধ একবার

সেই মুখখানি দেখিয়া লইলাম। তখনও চন্দনের রেখা সেই সুন্দর ললাটে রহিয়াছে, তখনও মুখে হাসি ;—নববধূবেশে কিশোরী কোথায় চলিয়া যাইতেছে! একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম; তাহার পরেই চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম।

সে তের বৎসরের কথা—কিন্তু এখনও আমার সমস্তই মনে পড়িতেছে। চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; কিশোরীর পিতাই মুখাগ্নি করিলেন,—আমি ত তাহার কেহ নহি।

তাহার পর এই তের বৎসর যাইতেছে; তোমরা শুনিলে বিশ্বাস করিবে না,—প্রতিপূর্ণিমার রাত্রিতে আমি ঐ দৃশ্য দেখিতে পাই। অন্য দিন কত চিন্তা করিয়াও মনে আনিতে পারি না; কিন্তু প্রতিপূর্ণিমার রাত্রিতে আমি দেখিতে পাই—আমি সেই সুসজ্জিত খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি; আর একটী কিশোরী নববধূবেশে আমার দিকে চাহিয়া আছে; আবার একটু পরেই দেখিতে পাই—হু হু করিয়া চিতা জ্বলিতেছে; আর যেন চিতার উপর একটী নববধূ গলায় ফুলের মালা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক পূর্ণিমা—দুই পূর্ণিমা নহে। তের বৎসর ধরিয়া আমি প্রতিপূর্ণিমা-রজনীতে এই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছি। প্রতিপূর্ণিমায় যাহার সম্মুখে এই চিতা জ্বলিয়া উঠে, সে কি আবার বিবাহ করিতে পারে? তাই আমি কুমার। ইহাই গোরাচাঁদের জীবনের ইতিহাস।

সেই দিনের পর হইতেই আমি একেবারে পল্লীবাসী হইয়াছি; সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছি। আবার কবে এক পূর্ণিমা আসিবে, যে দিন আমি অমন করিয়া চলিয়া যাইব!

দেশ ভ্রমণ।

দেশ-ভ্রমণ।

একবার একজন খাঁটী কলিকাতাবাসী নব্যযুবক পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার তেইশ বৎসর বয়সব্যাপী দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি ওদিকে হাবড়ার ষ্টেসন, এদিকে বেলিয়াঘাটা; আর সেদিকে কালীঘাট এবং ঐদিকে চিৎপুরের খাল দেখিয়াছিলেন। এত বৃহৎ চৌহদ্দি-বেষ্টিত মহাভূভাগ তাঁহার দৃষ্টতঃ পৃথিবী; অবশিষ্টটা Geography নামক মহাভীতিজনক শাস্ত্রবিশেষের অন্তর্গত; এবং প্রবেশিকা-পরীক্ষারূপ কাঁটার বেড়া ডিঙ্গাইয়াই তিনি উপরি-উক্ত মহাশাস্ত্রখানি পুরাতন পুস্তকের দোকানে দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। এহেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিপ্রবরের দেশভ্রমণে বাহির হওয়া—ভারতইতিহাসের না হউক, বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটি অতি স্মরণীয় ঘটনা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার ন্যায় এক জন ক্ষুদ্র ব্যক্তি ব্যতীত কোন ঐতিহাসিকই এই মহাব্যাপারের একটা নোট পর্য্যন্তও রাখেন নাই। অতএব সাধারণের অবগতির জন্য, এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণের স্মৃতিশক্তির উন্মেষের জন্য আমি এই অভূতপূর্ব্ব দেশভ্রমণ-কাহিনী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে দিন কলিকাতা ত্যাগ স্থির হইল, তাহার ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুবর ভাবিয়া অস্থির! কি কি দ্রব্য সঙ্গে লইতে হইবে, কয়খানি কাপড় চাই, বিছানা কতগুলি লইতে হইবে, সঙ্গে খাবার জিনিস কি কি লইয়া যাওয়া দরকার,—এই সব অত্যাবশ্যক প্রশ্ন এবং সুগম্ভীর ভাবে অনতিদীর্ঘ নোট-বুকে সেগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখা হইতে লাগিল।

দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, যখন আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই সেই নোট-বুক বাহির হইয়াছে এবং প্রায় এক ঘণ্টা, কোন কোন দিন তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় ধরিয়া তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের জবাব লিখিয়া দিতে হইয়াছে। আর সেই সমস্ত প্রশ্নের উপর আবার জেরা; আমি ত একেবারে হয়রান্ হইয়া গিয়াছিলাম। তবুও, যাহা হউক, মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে, বন্ধুবর পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই প্রকাণ্ড একখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবেন, এবং তাহাতে—পাঠক সাধারণের না হউক—কাগজওয়ালা, প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও দপ্তরী মহাশয়ের কিছু লাভ নিশ্চয়ই হইবে; এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়গণ দুই এক মাস ক্রমাগত অনেক তোষামোদ শুনিতে পাইবেন।

সে কথা থাক্, বহুকষ্টে অনেক পরিশ্রমে, বড়বাজার, চিনেবাজার, রাধাবাজার, চাঁদনী, বহুবাজার প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বন্ধুবর তাঁহার ভ্রমণের সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমাকে যদি পশ্চিম কি দক্ষিণ ভারতে যাইবার জন্য এই দণ্ডে অনুরোধ আসে, তাহা হইলে আমি মনিব্যাগে কয়েকটি টাকা লইয়া এবং আল্না হইতে ঐ উড়নী চাদর এবং একখানি পিচের ছড়ি লইয়া এখনই বাহির হইতে পারি; এবং নিরাপদে অক্লেশে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যথাসময়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারি। বন্ধুবর এ কথা মোটেই বিশ্বাস করিতে চান না, বিভুঁই বিদেশে কোন জিনিসের দরকার হইলে,—মনে কর একখানি সাবানের দরকার,—তখন কোথায় তাহা পাওয়া যায়? বলিতে চাহিয়াছিলাম, এত যার জঞ্জাল, যার এতগুলি উনকুটী চৌষট্টি দরকার, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র-গৃহ-কোণ এবং আফিসের চেয়ারই প্রশস্ত স্থান। কিন্তু বন্ধুবরকে সে কথা বলা তখন উচিত মনে করি নাই।

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেসনে গোয়ালন্দ-মেলের সময়ে গেলাম। তাঁহার সঙ্গের লট-বহর দেখিলে সহসাই মনে হয়, যেন তিনি বৎসর দুই তিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য রামকৃষ্ণ। আমি জানিতাম, বন্ধুবর একাকীই যাইবেন ; কিন্তু ষ্টেসনে রামকৃষ্ণের বেশভূষা দেখিয়াই বুঝিলাম, রামকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গী।

নিজের জন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং রামকৃষ্ণের জন্য একখানি মধ্যম শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া তাঁহারা ষ্টেসনের প্ল্যাট্‌ফরমে গেলেন। বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি একটু পিছাইয়া পড়িলাম, এবং ঢাকার একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া, বন্ধুবর যে গাড়ীতে জিনিস পত্র উঠাইয়া বসিয়াছেন, ধীরে ধীরে যাইয়া আমিও সেই গাড়ীতে বসিলাম। তিনি তখনও জানেন না যে, আমিও তাঁহার সঙ্গী। তিনি মনে করিলেন, প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর মনে করিয়াই আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িল, আমি তখনও স্থিরভাবে গাড়ীতে বসিয়া। এমন সময়ে একটি বাবু একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত এ গাড়ীতে অপর কেহই উঠেন নাই। বাবুটীর সঙ্গেও জিনিস পত্র কম ছিল না ; কুলিরা তাড়াতাড়ি সেগুলি গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিল, এবং শেষে বাবুর সঙ্গে পয়সা লইয়া মহাগণ্ডগোল বাধাইয়া দিল। বাবুও প্রত্যেককে দুই পয়সার বেশী কিছুতেই দিবেন না, তাহারাও দুই আনার কম ছাড়িবে না। একবার মনে হইল, মধ্যস্থতা করিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিই, কিন্তু আবার নানা কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। আমা-দিগকে আর মধ্যস্থতা করিতে হইল না ; বাবুর সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটীই অতি অল্প আয়াসে গোল নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন বাবুর মনিব্যাগ কাড়িয়া

লইয়া স্ত্রীলোকটি তাহার মধ্য হইতে একটি টাকা লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। কুলীগণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। বাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রমণী তাঁহাকে বাধা দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ভাষায় বাবুকে বলিলেন, "কুলী-মজুরের সাথে দুইডা পয়সা লইয়া ঝগরা করিতে লজ্জা হইল না! বাবু আমাদের দিকে চাহিয়া রমণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

শেষ ঘণ্টা বাজিতে শুনিয়া বন্ধুবর আমাকে শীঘ্র নামিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "বাঃ! তুমি ত বেশ লোক। ঢাকায় যাইব বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়াছি, তুমি বল কিনা নামিয়া যাও।" বন্ধু ত আমার কথা শুনিয়া অবাক্! সঙ্গে জিনিস পত্র নাই, দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত নাই, অথচ আমি তাঁহার সঙ্গে ঢাকা যাইতেছি, এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; মনে করিলেন, আমি তামাসা করিতেছি, এখনই নামিয়া যাইব। কিন্তু গাড়ী ছাড়িল, তবুও আমি বসিয়া রহিলাম। তখন বন্ধু বুঝিলেন, আমি সত্য সত্যই তাঁহার সঙ্গী। তিনি ত ভাবিয়া অস্থির; আমার নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে মনে ভাবিয়াই তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার দুইটি ষ্টিল ট্রাঙ্কে যে কাপড়-চোপড় আছে, তাহাতে ঢাকা কেন, আমাদের দুইটি প্রাণীর ভূপ্রদক্ষিণ চলিতে পারে। বিছানার বিশেষ দরকার নাই। বিনা বিছানায়, ভূমিশয্যায়, অনাবৃত মস্তকে, অনন্ত বিস্তৃত নক্ষত্রখচিত নীলচন্দ্রাতপতলে অনেক বিনিদ্র রজনী আমার অতিবাহিত হইয়াছে। তরুমূলে আশ্রয় পাইলে যে সুখশয্যা মনে করিত, রেল গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর গদিমোড়া আসন তাহার নিকট সম্রাটের শয্যা। তাহার পর পকেট হইতে ব্যাগটি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে দশটি টাকা আছে দেখাইয়া বলিলাম, "অবশিষ্ট অসুবিধা এই কয়েক খণ্ড রৌপ্যের সাহায্যে দূর হইবে।"

আমি তাঁহার সঙ্গী হইব, এ কথা পূর্ব্বে বলিলে, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, অর্থাৎ আরো দুই তিনটা লগেজ বাড়িত, বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত তিনি এই কথাই বারংবার বলিতে লাগিলেন। যাহা হউক, "গতস্য শোচনা নাস্তি" এই ঋষিবাক্যে নির্ভর করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

এতক্ষণ আর গাড়ীর মধ্যস্থ তৃতীয় ভদ্রলোকটী ও তাঁহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিবার আমাদের অবকাশ ছিল না, তাঁহাদেরও ছিল না। তাঁহারা দুইজনে জিনিসপত্র সমস্ত বেঞ্চের নীচে ও অন্যান্য স্থানে গোছাইয়া রাখিতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। গাড়ী যখন শিয়ালদহ ছাড়িয়া খানিক দূর গিয়াছে, তখন তাঁহারা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা কে, কোথায় যাইবেন, কি বৃত্তান্ত প্রভৃতি জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ হইল। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহারই জিজ্ঞাসা করা উচিত; কারণ তাঁহার সঙ্গে রমণী; আমরা দুইটী অপরিচিত যুবক তাঁহাদের সঙ্গে এক প্রকোষ্ঠের আরোহী; এ অবস্থায় আমাদের সঙ্গে আলাপ করা তাঁহারই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহার সেপ্রকার আগ্রহ দেখিলাম না, রমণীও এতক্ষণ গাড়ীর জানালাতে মুখ দিয়া প্রকৃতির শোভা বা তেমনি কিছু দেখিতেছিলেন।

আমরা সকলেই নির্ব্বাক্! বোধ হয় রমণীর এ নীরবতা ভাল লাগিল না, তাই তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "তুমি কেমন বেটা ছেলে! বাবুদের সঙ্গে পরিচয় কর না; তোমার মত মেয়েমুখো ত দেখি নাই!" এমন মধুর বচন শুনিয়া আমাদের মনে খট্‌কা লাগিল। কোন কোন শয়নকক্ষে স্বামী স্ত্রীতে এরকম কথাবার্ত্তা হয় শুনিয়াছি, কিন্তু গাড়ীর মধ্যে, দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে একজন ভদ্র গৃহস্থের বধূ—এমন ভাবে, এমন ঢঙ্গে কথা বলিতে পারেন,

তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমার মনে হইল, রমণী কুলবধূ নহেন; বন্ধুবরের কর্ণমূলে আমার এই সন্দেহ অনুচ্চ স্বরে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। তিনিও তাহাই স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের কথাবার্ত্তা বলিবার স্পৃহা একেবারেই কমিয়া গেল। পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের সঙ্গী ভালই জুটিল!

এদিকে রমণীর উপদেশে বাবুটী আমাদিগের নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং আমরা কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুসারে "নিবাস" "আপনারা" প্রভৃতি প্রশ্ন হইল। বন্ধুবর এপ্রকার প্রশ্নের অর্থই বুঝিতে পারিলেন না, আমি তাঁহার সকল কথারই জবাব দিলাম। এবং অতি সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় লইলাম। বাবুটী ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামের জমীদার, বিষয়কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এখন ঢাকায় যাইতেছেন, ঢাকায় তাঁহার বাসা আছে। আমরা ঢাকায় বেড়াইতে যাইতেছি শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন, এবং সেখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, এ কথাও জানাইয়া দিলেন।

বোধ হয়, পুরুষপুঙ্গব আলাপটি ভাল করিয়া জমাইতে পারিলেন না দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গিনী আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন, এবং "বাবুরা ইতিপূর্ব্বে বুঝি আর ঢাকায় আসেন নাই?" বলিয়া আমাদের উপরে প্রশ্ন বর্ষণ করিলেন। বন্ধুবর জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আমি গা টিপিয়া নিষেধ করায় তিনি চাপিয়া গেলেন; রমণীর প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হইল না। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নন, "শোন্‌ছেন্ নি?" বলিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন। তখন ঈষৎ বিরক্তির স্বরে আমি একটা "হুঁ" দিয়াই সারিয়া দিলাম। রমণী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। স্ত্রীলোকের অশেষ গুণের মধ্যে একটা প্রধান গুণ এই যে,

তাহারা পুরুষের কথার ভাবেই তাহাদের মন অনায়াসে বুঝিতে পারে।

কথাবার্ত্তার সুবিধা হইল না দেখিয়া, তাঁহারা উভয়ে বিছানা পাতিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। আমরা সে রাত্রে ঘুমাইব না, দুইজনে গল্প করিয়াই রাত্রি কাটাইব স্থির করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, রাত্রিতে আর এ গাড়ীতে অপর কেহ উঠিবে না। কিন্তু আমাদের সে আশা বৃথা হইল। বগুলা ষ্টেসন হইতে গুটি তিনেক ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন, এবং একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ লাগাইয়া দিলেন। তাঁহাদের চেঁচামেচিতে নিদ্রিত বাবু ও বাবুর সহচরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহারা উভয়েই উঠিয়া বসিলেন।

নবাগত বাবুত্রয় খুব চালাক চতুর; কথাবার্ত্তায় খুব সাকুব বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা বঙ্গদেশীয় বাবুটির পরিচয় লইতে বসিলেন, এবং ভাবগতিকে বুঝিতে পারিলেন যে, সঙ্গিনী গৃহিণী নহেন। সুতরাং তাঁহারা ধীরে ধীরে রসিকতা আরম্ভ করিলেন। সকল কর্ম্মেরই একটা সময় অসময় আছে। দুই এক সময় আছে, যখন একটু আধটু রসিকতা বেশ মিষ্ট বোধ হয়; কিন্তু রাত্রি একটা দুইটার সময়ে কতকগুলি ভদ্রলোকের সম্মুখে কুলটার সঙ্গে রসিকতা নিতান্তই যেন অভদ্রোচিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু আমাদের ভদ্রাভদ্রে তাহাদের কি যায় আসে! বাবুত্রয় বেশ ঠাট্টা তামসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে দেখি, রমণীও নিতান্ত কম নহেন; তিনিও বেশ দুই একটি উত্তর দিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা জমিয়া আসিল; এমন কি, দুই এক স্থানে শ্লীলতার সীমাও অতিক্রম করিতে লাগিল। আমার সঙ্গী বন্ধু ত লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রেলের গাড়ীতে এ প্রকার অভদ্র ব্যবহার দর্শন আমার পক্ষে এই নূতন নহে; সুতরাং আমি এমন দুই দশটা ব্যাপার

উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিলাম। কিন্তু বন্ধু ত তাহা নহেন; তিনি কখনও বিদেশে যান নাই; কলিকাতার গৃহ-কোণে পিতা মাতা ভগিনীর স্নেহাদরে প্রতিপালিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার ছায়াতলে শিক্ষিত, পুষ্ট; তাঁহার মধ্যে নাগরিক উচ্ছৃঙ্খলতার কোন চিহ্নই ছিল না; তাঁহার হৃদয়ে অসৎ ভাবের বিকাশই হইতে পায় নাই। তিনি এই সব দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেলেন, এবং যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে অন্য গাড়ীতে যাইতেও প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাহা একপ্রকার অসম্ভব, এত জিনিসপত্র টানিয়া লইয়া দ্বিতীয় গাড়ীতে যাওয়া কম ব্যাপার নহে। বন্ধুবর অগত্যা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যেন কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া দেখিলাম। এ উপলক্ষে নহে, কলিকাতা হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর হইতেই যেন তাঁহার দেশ-ভ্রমণের স্ফূর্ত্তি একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছিল। নির্জ্জন অন্ধকার প্রান্তরের ভিতর দিয়া যখন আমাদের লৌহশকট সশব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন অনভ্যস্ত ভ্রমণকারীর মনে যে কেমন একটা ভাবের উদয় হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। চিরপরিচিত গৃহপ্রকোষ্ঠ, কুসুম-কোমল শয্যা, মাতাপিতার শত সহস্র আদরযত্নের চিহ্নে পরিপূর্ণ শয্যাগৃহের কথা মনে হওয়াতেই সঙ্গী বোধ হয় এমন বিষণ্ণ হইতেছিলেন।

রেলের গাড়ীতে একটি ব্যাপার বোধ হয়, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেটা কি জানেন?—এই গান করা। যিনি একটু আধটুকু গাহিতে জানেন, তিনি না হয় গান করিলেন, তাহা একপ্রকার সহিয়া থাকা যায়; কিন্তু যাঁহার কণ্ঠের রবের সহিত চতুষ্পদ জীববিশেষের মধুর নিনাদের তুলনা অনুচিত হয় না, তিনিও রেলের গাড়ীতে চড়িলে একবার তান ছাড়িয়া নিরীহ লোকদিগকেও বিরক্ত করিয়া তুলেন। আমাদের সহযাত্রী নবাগত বাবুদের মধ্যে এইপ্রকার সুগায়ক একজন

ছিলেন। তিনি সেই শেষরাত্রিতে কোকিলকণ্ঠে গান জুড়িয়া দিলেন ;— তার না আছে স্থর, না আছে কিছু। তাঁহার একজন সঙ্গী আবার এমন গানটি বৃথা যাইতেছে দেখিয়া, গাড়ীর দেওয়ালকে বাদ্যযন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া তুমুল বাজনা জুড়িয়া দিলেন,—দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বলিয়া গদির উপর বোল তুলিতে পারিলেন না। শ্রীমান্ গায়ক মহাশয় যদি ভাল গান গাইতেন, তাহা হইলেও না হয় হইত, কিন্তু তিনি তাঁহার কৃষ্ণনগরের আমদানী পচা সরপুরিয়ার গান জুড়িয়া দিলেন; যেমন তার ভাব, তেমনি তার রচনা-কৌশল!

এ সকল অত্যাচার আমার অনেক সহিয়াছে। কিন্তু সঙ্গী বন্ধু মহাশয় ত একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন, এবং আমাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। আমার অপরাধ এই যে, আমি এ সব পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিলে তিনি একটা কামরা রিজার্ভই করিতেন। আমি এ অনুযোগের আর কি জবাব দিব, তিনি যে এতটুকুও সহিতে পারিবেন না, তাহা ত আমি জানিতাম না। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন সঙ্গী কখনও ত জোটে নাই; সুতরাং বন্ধুবরের অভিযোগ নীরবে সহ্য করা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর ছিল না।

একটি গান শেষ করিয়া কিন্নরপ্রবর যখন আর একটি গানের রাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমি তাঁহাদের গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, বেশী দূরে নয়, এই পোড়াদহে। তাঁহারা রেলে চাকুরী করেন; পোড়াদহে নামিয়া উত্তরদেশের গাড়ীতে যাইবেন। আমি তখন চুপে চুপে বন্ধুকে বলিলাম যে, বাবুকয়টিকে এই সুমুখের ষ্টেসনেই নামাইয়া দিতে পারিব; পোড়াদহ পর্য্যন্তও তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে না। বন্ধু আমাকে জেরা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহাকে তখন বাক্যব্যয় করিতে

নিষেধ করিলাম। আমি বাবু কয়টির আকার-প্রকার ও ব্যবহার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহারা রেলে চাকুরী করিলেও হয় টিকিট-বাবু কি তারের বাবুগিরি করেন্। তাহার উপর পদের রেলের বাবু হইলে, তাঁহারা অনেকটা সভ্য হন; এই তিনটি বাবু নিতান্তই 'রেলের বাবু'। আমি তখন বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, রেলের মধ্যে কি কাজ করা হয়?" একজন একটু ইংরেজী হিসাবে বলিলেন, "আমরা ষ্টেসন ষ্টাফ।" আমি তখন বলিলাম, "মহাশয়দের কি সেকেণ্ড ক্লাসের পাস আছে?" যে বাবুটি আমার কথার জবাব দিয়াছিলেন, তিনি একটু চড়িয়া বলিলেন, "সে খবর আপনার কেন? চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন।" আর সেই সঙ্গে একটা ইংরেজী প্রবাদ-বচন ষোল-আনা ভুল করিয়া আওড়াইয়া দিলেন; তাহার অর্থ এই যে, আমি আমার নিজের যন্ত্রে তৈল প্রদান করি। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন; এই সম্মুখের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে যদি নামিয়া না যান, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে অগত্যা পুলিশের জিম্মা করিয়া দিব। আপনারা যদি ছুটিতে থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপর পাস নাই, আর যদি সহকারি-কার্য্যে যান, তবে মধ্যম শ্রেণীর পাস; দ্বিতীয় শ্রেণীর পাস আপনাদের নিশ্চয়ই নাই।" বাবু তিনটি আর কথা বলিলেন না; চুপ করিয়া গেলেন। গাড়ীরও গতি মন্দ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন গাড়ী চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনের নিকট আসিল, তখন আমি বলিলাম "মহাশয়েরা কিছু মনে করিবেন না, আমি গার্ড সাহেবকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।" তখন সেই বাবুত্রয়ের মধ্যে যিনি গান বাজনা কিছুতেই ছিলেন না, তিনি বলিলেন, "মহাশয়! এত গোলমাল কেন; তাড়াতাড়িতে এই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম; আমরা এখানেই নামিয়া অন্য গাড়ীতে যাইব।" আমি আর কথা

বলিলাম না। ষ্টেসনে গাড়ী লাগিল, বাবু তিনটি নামিয়া গেলেন। আমার সঙ্গী একটু সোয়াস্তি বোধ করিলেন। বাবুদের এইপ্রকার দুর্গতি দেখিয়া ঢাকাগামিনী রমণী ত হাসিয়া অস্থির। তাঁহার হাসি দেখিয়া বন্ধু বড়ই চটিয়া গেলেন এবং ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন, "ভায়া! এর চাইতে বাবুদের গান যে ছিল ভাল!" আমি দেখিলাম, এমন সঙ্গী লইয়া পথ চলা এক বিষম বিড়ম্বনা। কিন্তু সে কথা আর মুখ ফুটিয়া বলিলাম না। অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। প্রত্যুষে আমরা গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলাম।

এতক্ষণও বলা হয় নাই, আমরা কি মাসে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। আশ্বিন মাস, পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা যেবার এই ভ্রমণে গিয়াছিলাম, সেবার পূর্ব্বাঞ্চলে ভয়ানক বর্ষা হইয়াছিল। আমরা গোয়ালন্দে নামিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। বন্ধুবর তখনও ভাল করিয়া চারিদিক্ দেখিতে পান নাই, কারণ ভোর হইলেও সে সময়ে একটু আঁধার ছিল। আমরা দুইজনে ভৃত্যটিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম।

ষ্টীমারের উপরে গিয়া বন্ধু নদীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখেন ভয়ানক ব্যাপার! নদীর অপর পার দেখিতে পাওয়া যায় না; অকূল জলরাশি গর্জ্জন করিতে করিতে, লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। ষ্টীমারখানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া বন্ধুবর একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট। এমন ভয়ানক নদীর মধ্যে ষ্টীমারে চড়িয়া যাইতে হইবে! তাঁহার মুখে আর কথা নাই, তিনি একেবারেই ভয়ে অসাড় হইয়া গেলেন। একটু পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "ভায়া! আমার আর আজ যাওয়া হইবে না; জান কবুল, এমন

ভয়ানক নদীর মধ্যে ষ্টীমারই বল, আর যাই বল, আমি কোন প্রকারেই যাইতেছি না। রামকৃষ্ণ, জিনিসপত্র নামাও।" বন্ধুবরের ভীতি-বিহ্বল মুখ দেখিয়া আমি ত একেবারেই অবাক্ হইয়া গেলাম; কি বলিব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমাকে এই-প্রকার অবস্থায় দেখিয়া বন্ধু বলিলেন, "আর নয় ভাই, চল, বাড়ীতে ফিরিয়া যাই, এরূপ নদীর মধ্যে আমি প্রাণ থাকিতে যাইতে পারিব না।"

যে কথা, সেই কাজ; বন্ধু মহাশয় একেবারে তাড়াতাড়ি নামিয়া ডাঙ্গায় গিয়া হাজির! তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু তখনও নামে নাই, আমিও নামি নাই। রামকৃষ্ণ আমার মুখের দিকে চাহিল, আমি বলিলাম "রামা! তুই একটু অপেক্ষা কর্, আমি দেখি, যদি তোর বাবুর ভয় ভাঙ্গিতে পারি।" আমি তখন জাহাজ হইতে নামিয়া বন্ধুর নিকটে গেলাম; তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম; কিন্তু বিশাল পদ্মার দিকে তিনি এক একবার চাহেন, আর তাঁহার বুক দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠে। তিনি আমার সাহসবাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া রামকৃষ্ণকে জিনিসপত্র নামাইতে বলিলাম। কুলী-দিগের সাহায্যে দ্রব্যাদি আবার তীরে আনীত হইল।

বন্ধু ফেরতগাড়ীতেই কলিকাতায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার আমি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "ষ্টীমারেই না গেলে; এ বেলা গোয়ালন্দে থাকিলে ত আর পদ্মানদী খাইয়া ফেলিবে না! এই সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আসা গেল; আবার সমস্ত দিন গাড়ীতে যাওয়া, আমার দ্বারা এমন কর্ম্ম হইবে না।"—আমার এই কথা শুনিয়া বন্ধুবর সে বেলা গোয়ালন্দে থাকিতে সম্মত হইলেন। ঢাকাগামী ষ্টীমার, আসাম ষ্টীমার, কাছার-ষ্টীমার ধূম উদ্গীরণ করিয়া তরঙ্গের

উপর নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। আমরা তিনটি জীব তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। ষ্টীমার চলিয়া গেলে, মুটে ডাকিয়া সেই প্রকাণ্ডকায় লগেজ, বাক্স প্রভৃতি লইয়া আমার এক বাল্যবন্ধুর প্রবাস-গৃহে অতিথি হইলাম। তিনি আমাদিগকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। আমরা ঢাকায় যাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু বন্ধুর আর ঢাকা যাওয়া হইল না, তাই আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছি। কেন যাওয়া হইল না, সে কাহিনী বলিয়া বন্ধুকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী, দুর্ব্বল বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করিয়া লজ্জা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলাম না। সমস্ত দিন গোয়ালন্দের পদ্মাতীরে অতিবাহিত হইল।

তাহার পর, রাত্রিতে মেলট্রেণে আরোহী হইয়া বন্ধুকে লইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম এবং একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটীয়া গাড়ী করিয়া তাঁহাকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিলাম। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া কত নোট সংগ্রহ করিবেন, সে সকল সুবিন্যস্ত করিয়া সুন্দর একখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবেন, এইপ্রকার নানা কল্পনা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পর আমি অনেক বার তাঁহাকে এই গোয়ালন্দ-ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। আজ এতদিন পরে তাঁহার দেশভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া আমি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া দিলাম।

শিকার-কাহিনী।

শিকার-কাহিনী।

প্রবন্ধ-সূচনাতেই পাঠক-মহোদয়গণকে অভয় দিতেছি, আমার এ প্রবন্ধে তুষারধবলিত হিমাচলের অভ্রভেদী শৃঙ্গের বর্ণনা নাই। আমি যে স্থানের কথা বলিতেছি, পশ্চিম দেশের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ ভৌগোলিকের নিকট থাকিতে পারে, অথবা ততোধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি কবির থাকিতে পারে; আমার ন্যায় খাঁটি গণ্ড মানুষের নিকট পশ্চিমের সঙ্গে এদেশের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি ১৮৭৮ অব্দের নবেম্বর মাসের শেষে, বোধ হয় ২৭শে নবেম্বর প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করি। তখন চারি দিনেই পরীক্ষা শেষ হইত। এখনকার মত পঞ্চম দিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে না হউক, অনেকগুলি বালককে "র‍্যাফেলের" আণবিক সংস্করণে পরিণত করিবার কল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বরগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে তখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, এবং সায়েন্স-ভীতিও এত প্রবল হয় নাই। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নির্জ্জন বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, সর-পুরিয়ার জন্মভূমি স্বনামধন্য কৃষ্ণনগরে, পঠিত, অপঠিত সমস্ত বিদ্যার বোঝা পরীক্ষকগণের পাঁচ সাত শত টাকা-পুষ্ট সবল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, একেবারে দীর্ঘ অবকাশ! মা সরস্বতীর সঙ্গে কিছু দিনের জন্য সম্বন্ধ ত্যাগের দীর্ঘ পরওয়ানা লইয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী কোন "কেতাব-কীট" পড়িতে শুনিতে বলিলে, তাঁহার উপদেশের প্রতিবাদ করিবার কষ্ট আর আমাকে স্বীকার করিতে হইত না; যাঁহারা দিবারাত্রি শুধু "পড় পড়" ভিন্ন অন্য উপ-

দেশ দিতেন না, তাঁহারাও এখন করুণকণ্ঠে কাতরবচনে আমার পক্ষ সমর্থন করিতেন—সুতরাং স্ফূর্ত্তির সীমা এতদিন যে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এই প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে আত্মীয় জনের স্নেহে তাহার চৌহদ্দি খুব বাড়িয়া গেল! আমি একেবারে দেশ ছাড়িয়া উত্তর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। উদ্দেশ্য দেশ-ভ্রমণ।

আমার এক খুড়ামহাশয় উত্তরবঙ্গ ষ্টেট্ রেলওয়ের সোদপুর লোকো-মোটিভ্ আফিসে চাকুরী করিতেন। আমরা আদর করিয়া তাঁহাকে "চাচা" বলিয়া ডাকিতাম; তিনি আমা অপেক্ষা ৮।৯ বৎসরের বড় ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই চাচার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে, পরীক্ষার পরেই তাঁহার নিকট বেড়াইতে যাইব। সে সময়ে দারজিলিং রেল হয় নাই; উত্তরবঙ্গ রেলের সীমা শিলিগুড়ি অবধি ছল; তবে রঙ্গপুর শাখা তখন খুলিয়াছে।

চাচার কাছে যাইব, সুতরাং বাড়ীতে বিশেষ আপত্তি হইল না। চাচা আমার জন্য একখানি মধ্যমশ্রেণীর যাতায়াতের পাস পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন সবে পার্ব্বতীপুর, সোদপুর সহর বসিতেছে; রেলও নূতন খুলিয়াছে। চাচা একটু উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী, তাই সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বলিয়া আমার জন্য একখানি পাস যোগাড় করিয়াছিলেন।

তখনও দারজিলিং মেলট্রেণ ছিল, আমি সেই মেলট্রেণে যথাসময়ে সোদপুরে চাচার বাসায় উপস্থিত হইলাম।

দূরদেশে আমাকে পাইয়া চাচা এবং তাঁহার বাসার অন্যান্য বন্ধুগণ বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহারা ৫।৭ জনে মিলিয়া একটা বাসা করিয়া থাকিতেন। আমি কবে কোথায় বেড়াইতে যাইব, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত হইল। আফিসের বাবুরা রবিবার ব্যতীত অন্য কোনও

দিন আমার সঙ্গী হইতে পারিবেন না; সুতরাং জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, পার্ব্বতীপুর প্রভৃতি স্থান একাকীই দেখিয়া আসিলাম। মধ্যে এক রবিবার জলপাইগুড়িতে কাটিয়া গেল; সেইজন্য সে রবিবারে চাচাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

অবশেষে একদিন আমাদের বাসার ফুলবেঞ্চে স্থির হইল যে, সম্মুখের শনিবার বৈকালের গাড়ীতে আমরা সকলে একত্রে শিলিগুড়ির জঙ্গলে শিকার করিতে যাইব। বাসায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-জন বন্দুক নাড়াচাড়া করিতে পারিতেন। একজন আমার চাচা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরপাড়ার এক ব্রাহ্মণ-সন্তান। ইঁহাদের দুইজনের সঙ্গেই দুইটি ভাল বন্দুক ছিল।

আমার চাচা দুইটি কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তিনি অতি সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারিতেন, এবং খুব ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি যে কখনও বাঘ মারিয়াছেন, তাহা শুনি নাই; তবে উড়ন্ত পাখী অনায়াসে মারিতেন; সুতরাং তিনি যে একজন ভাল পাখী মারা, তাহা আমি জানিতাম। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাকে বধ করা আমার পূজনীয় খুড়ামহাশয়ের সাধ্য কি না? সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। দক্ষিণদেশী উত্তরপাড়াবাসী টেড়ীকাটা টপ্পাবাজ ব্রাহ্মণসন্তান যে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সিংহশাবক লইয়া আসিতে পারেন, তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে, আমি সেটা বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

চাচাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উপায়ে তিনি বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু শিকার করিবেন। তিনি বলিলেন, যাহারা সাপ খেলায়, তাহারা বাঁশী বাজাইয়া সাপকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে;—জীবজন্তুমাত্রই সুস্বর শুনিতে ভালবাসে। তাহার পর তিনি, বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীতে

যে যমুনা উজান বহিত, তাহাও অসম্ভব নহে, ইহা সপ্রমাণ করিতে বসিলেন। বাঁশী যে অনেক গুণ জানে, তাহা এই বৈষ্ণবপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আজন্ম বৈষ্ণবগৃহে পালিত হইয়া, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে পারিয়াছি। খুড়া মহাশয় এহেন বাঁশীর স্বরে বনের হিংস্রজন্তুকে টানিয়া আনিবেন, এবং শেষে বেশ ধীরে সুস্থে চুরুট টানিতে টানিতে তাহার প্রকাণ্ড শরীরে গুলি বসাইয়া দিবেন, ব্যাঘ্র-প্রবরও গতজীবন হইয়া খুড়ীমহাশয়ের জয়ঘোষণা করিবে,—এ বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ বোধ হইল না।

সোদপুর ও অন্যান্য রেল আফিসে সে সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি স্থানান্তর হইতে আনিবার জন্য প্রত্যেকেরই এক একখানি পাস ছিল,—তাহার নাম Provisions Pass। সে সময়ে সবে নূতন সহর বসিয়াছে, অনেকস্থানে বাজার হাট বসে নাই, তাই কর্ম্মচারিগণ ছুটির দিনে নিজেরা যাইয়া বা অন্যদিনে চাকর পাঠাইয়া, যেখানে যে দ্রব্য ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিতেন। শনিবারে তাঁহারা সকলেই সেই রকমের এক একখানি পাস লইয়া গাড়ীতে চড়িলেন, আমার একমাসের যাতায়াতের পাস ছিল, এবং তাহাতে লেখা ছিল, এই একমাস আমি ঐ রেলের সর্ব্বত্র যতবার ইচ্ছা বেড়াইতে পাইব।

শিলিগুড়ির রেল ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ আমাদের যাওয়ার সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এবং আমাদের অভ্যর্থনার জন্যও যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে শিলিগুড়িতে নামিয়া ষ্টেশনে পরম সমাদরে অবস্থান করা গেল; এবং প্রত্যুষেই জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাওয়া হইবে, স্থির হইল। শিলিগুড়ির বন্ধুগণ নিকটস্থ একটি চা-বাগানের এক ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া

রাখিয়াছিলেন। সেই চা বাগানের মধ্যে দুই তিন স্থানে খুব জঙ্গল ছিল, এবং সেই জঙ্গলের ধার দিয়াই একটি ক্ষুদ্রকায়া পর্ব্বতনদী ধীরে ধীরে বাহিয়া যাইতেছিল। ব্যাঘ্র মহাশয়গণের অন্য দিকে দৃষ্টি আছে কি না, জানি না; কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য নির্ম্মল জল যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের বিশেষ জানা আছে; নিকটে নির্ম্মল জলাশয় না থাকিলে বাঘ সেখানে থাকেন না,—তাঁহার পানীয় জল নির্ম্মল হওয়া চাই।

পূর্ব্ব-কথিত চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেব নিজে একজন ভাল শিকারী, তাঁহার অধিকার মধ্যে যেখানে যেখানে ব্যাঘ্রের গতিবিধি আছে এবং যে যে স্থানে তাহারা জলপান করিতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তাহার সন্ধান তাঁহার জানা ছিল; এবং তিনি সেই সেই স্থানে গাছের উপর বাঁশ কাঠ দিয়া বেশ ভাল বসিবার স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই সমস্ত স্থানকে সে দেশে "টঙ্গ" বলে।

ডিসেম্বর মাস, শীতকাল, প্রত্যূষে উঠিয়া শীতে হি হি করিতে করিতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করা গেল। তাহার পর দুই তিন পেয়ালা করিয়া গরম চা পান করিয়া, আমরা ছয়জন ও শিলিগুড়ি ষ্টেশনের দুইজন, এই আটজনে শিকারে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে এক জন ভৃত্য চলিল, তাহার স্কন্ধে দুইটি বন্দুক; ম্যানেজার সাহেব আরও দুইটি বন্দুক যথা-স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তিনি নিজেই এই শিকারে যোগ দিতে পারিতেন, কিন্তু সম্মুখের মেলে তাঁহাকে বিলাতে অনেক চিঠীপত্র ও রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার অবকাশ ছিল না।

একজন কি দুইজন হইলে অতি সহজ কাজেও কেমন একটু আশঙ্কা হয়; কিন্তু আমরা কতকগুলি মানুষ, উৎসাহে কেহ কম নহেন,—সুতরাং তখন মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না, মহা-উৎসাহে আমরা

পরিষ্কার চা-বাগান পার হইয়া জঙ্গলে গিয়া পড়িলাম। এই স্থানে সাহেবের বেহারা দুইটি বন্দুক লইয়া আসিল, এবং সাহেব তাহাকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে বলিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এই বেহারা সে জঙ্গলের সমস্ত স্থানই জানিত; সে আমাদিগকে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, শেষে একটা ক্ষুদ্র নদীর ধারে লইয়া গেল, এবং বেলা নয়টা কি দশটার সময়ে সেখানে বাঘের আগমন-সম্ভাবনা জানাইল।

আমরা তখন দুই দলে বিভক্ত হইলাম। একদল, নদীর একেবারে কিনারায় যে "টঙ্গ" ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিলাম; অপর দল একটু দূরে বাঘের পথের পার্শ্বে আর একটি "টঙ্গে" বসিলেন। চাচা আমাদের দলে রহিলেন, আমাকে ছাড়িয়া থাকা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। সাহেবের বেহারাও আমাদের দলে রহিল। আমরা গাছের উপর এমন স্থানে বসিলাম যে, সেখানে বাঘের পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলাম। চাচা তখন তাঁহার প্রকাণ্ড অলষ্টার কোটের পকেট হইতে সুন্দর ফ্লুট বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাঁশী অনেক দিন অনেক বার শুনিয়াছি; কিন্তু সে দিন তাঁহার বাঁশী সত্য সত্যই অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত নৈপুণ্য, বাঁশীর ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি বাছিয়া বাছিয়া সময়োচিত সুন্দর সুন্দর রাগিণী বাজাইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, খুড়ামহাশয় শিকারের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে,—শুধু সেই বাঁশী একবার করুণ স্বরে, একবার তীব্র স্বরে, আবার ধীরে ধীরে গভীর মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া চাচার অদ্ভুত শিক্ষা দেখিতে লাগিলাম। বাঁশীর স্বর সমস্ত বনভূমি প্লাবিত করিয়া, দূর জঙ্গলের পত্রাবলীর মধ্যে ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু

বাঘ ত আসিল 'না! অবশেষে ক্লান্ত হইয়া চাচা বাঁশী ত্যাগ করিলেন।

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। শেষে বেহারা পরামর্শ দিল, বাঘ অবশ্যই নিকটে আছে—একবার নীচে নামিয়া একটু সন্ধান করিলে ভাল হয়। বাঘের মুখে এমন করিয়া কে যাইতে চাহে? আমরা দুই তিন জন একেবারে জবাব দিয়া বসিলাম। কখনও বন্দুক ধরি নাই,—আমরা নিতান্ত বর্ব্বরের মত প্রাণটা এই জঙ্গলে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত নহি। বেহারা বলিল, "এ জঙ্গলে যে বাঘ আছে, তাহারা বড় নহে; ছোট ছোট বাঘ—বোধ হয় নেকড়ে হ'বে।" "হাঁ, নেকড়ে বাঘ, তারি জন্য আবার ভয়!" এই বলিয়া আমার খুড়ামহাশয় নীচে নামিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁর Huntiug Dress পরা ছিল, তিনি তাহা লইয়াই নামিতেছিলেন। আমি অলষ্টারটা মায় বাঁশী সঙ্গে লইতে বলিলাম,—কি জানি, যদি বাঘের উদরেই তাঁহাকে যাইতে হয়, তবে বাঁশীটিরও সহমরণে যাওয়া উচিত। চাচা অলষ্টার লইলেন না, কিন্তু বেহারাটা তাঁহার অলষ্টার কাঁধে ফেলিয়া ও দুই হাতে দুইটি গুলিপুর্ণ বন্দুক লইয়া নীচে নামিল। চাচার হাতে একটি বন্দুক। তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়া গেলেন, যদি আমরা নিকটে বাঘের সাড়া পাই, তাহা হইলে আমরা যেন একটা শব্দ করি, শব্দ শুনিলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন।

তাঁহারা দুই জনে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সাড়া-শব্দও আর পাওয়া যায় না। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে আমাদের নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে সড়্ সড়্ শব্দ হইতে লাগিল, এবং জঙ্গলের গাছ-পালা কাঁপিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, হয় বাঘ আসিয়াছে, আর না হয় আমাদের সঙ্গিগণই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চাচার আদেশমত সঙ্কেত করা আবশ্যক বোধ

হইল। আমরা যে কয়জন ছিলাম, তাহাদের একজনের পকেটে একটা রেলগাড়ীর whistle ছিল; তিনি তাহাই বাজাইলেন। কিছুক্ষণ কোনও শব্দই পাওয়া গেল না। প্রায় সাত আট মিনিট পরে দেখা গেল, দুই তিন জন কুলি সঙ্গে, বেহারা ও খুড়ামহাশয় অতি ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদের গতি-বিধি বেশ দেখিতে পাইলাম। জঙ্গলের পার্শ্বে আসিয়া সাহেবের বেহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, শেষে নিজের স্কন্ধ হইতে চাচার সেই প্রকাণ্ড অলষ্টার ও বাম হস্তের বন্দুকটি মাটিতে রাখিয়া, অপর বন্দুকটি লইয়া বসিল, এবং নিঃশব্দে নিশানা লইতে লাগিল; চাচাও তাহার পার্শ্বে বন্দুক ধরিয়া বসিলেন। চক্ষুর নিমিষে একটা আওয়াজ হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ডকায় নেকড়ে বাঘ লাফাইয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। বেহারা বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। বাঘকে রাস্তার উপরে দেখিয়া চাচা যেই পাশ ফিরিয়া গুলি করিতে যাইবেন, অমনই দেখিতে না দেখিতেই ব্যাঘ্র-মহাশয় এক লম্ফে একেবারে চাচার স্কন্ধে আসিয়া পড়িলেন। আমরা ভয়ে আড়ষ্ট; কিন্তু দেখিলাম, চাচা বাঘের শরীরের নীচে হামাগুড়ি দিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার বন্দুকটি ছুটিয়া অনেক দূরে যাইয়া পড়িয়াছে। আমরা সেই 'টঙ্গ' হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দিশেহারা হইয়া বেহারা-বেচারী আর দ্বিতীয় বন্দুক কুড়াইবার অবকাশ পাইল না। তাহার পর মনে হইল, বাঘ হয় ত এতক্ষণ চাচার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিতেছে। বেহারা তখন দেখিল, তাহার হাতের কাছেই চাচার সেই প্রকাণ্ড অলষ্টার পড়িয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি সেই অলষ্টার তুলিয়া বাঘের মাথায় ফেলিয়া দিল। সাহেবী অলষ্টারের অষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে বোতাম; বন্ধনী, বেল্ট্। কেমন করিয়া জানি না, অলষ্টারটি যেই বাঘের মাথায়

পড়িয়াছে, আর সে মাথা নাড়া দিয়াছে। কোনও স্থানে কোনও বোতাম হয় ত আট্‌কান ছিল, বাঘ-মহাশয় মাথা নাড়া দিতেই তাহার অদৃষ্টফলে অলষ্টারটি তাহার মাথায় বেশ আট্‌কাইয়া গেল। বাঘ মনে করিলেন, এ আবার কি এক ভীষণ জন্তু তাহার পৃষ্ঠে উপস্থিত! চাচার কথা তখন আর তাহার মনে নাই। বাঘ সেই অলষ্টারের বোঝা লইয়া পলাইবার পথ পায় না—ভয়-চকিত হইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমরা অবাক্! চাচা তখন গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা সকলে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া চাচাকে অক্ষতশরীর দেখিয়া মহা-আনন্দিত হইলাম।

বেহারা বেচারীর উপস্থিত বুদ্ধিতেই চাচার এবার প্রাণরক্ষা হইল। আমাদের শিকার সে দিনের মত শেষ হইল। সকলে ফিরিবার আয়োজন করিলাম। বেহারা সাহেবের বাঙ্গালার দিকে চলিয়া গেল; চাচা তাহাকে পাঁচটি টাকা পুরস্কার দিলেন।

রাস্তায় আসিতে আসিতে চাচার আর আপশোষের সীমা নাই; তাঁর অলষ্টারটি গেল, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ নাই, প্রাণটি যে যাইতেছিল, সে কথা একবারও বলা নাই; কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন— তাই ত হে, আমাকে একেবারে হতভম্ব করিয়া বাঁশীটা লইয়া গেল!— এমন বাঁশী আর হবে না!”

আমার সেই পূজনীয় খুড়ামহাশয় এখন স্বর্গে, নতুবা তাঁহার মুখ হইতে এই গল্পটা শুনাইতে পারিলে বড়ই আমোদ হইত। তিনি এই শিকারের গল্প করিতে গেলেই প্রতিবার তাঁর সেই বাঁশীটার জন্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

ব্যাঘ্র-শিকার।

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া যিনি আমাকে একজন প্রকাণ্ড শিকারী ভাবিয়া বসিবেন, তাঁহার অবগতির জন্য এই স্থানেই নিবেদন করিতেছি যে, গোলাগুলি দূরে থাকুক, এই বাঙ্গালী জীবনে কখনও সামান্য পট্‌কায় অগ্নি-সংযোগের সাহসও আমার হয় নাই। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, শুধু Constitutional agitation-এ ভারত উদ্ধার হইবে, এই আশ্বাস পাইয়াই মধ্যে মধ্যে ভারত-মাতার উদ্ধার-সাধনে কৃতসংকল্প সভাসমিতিতে যোগদান করি ; কিন্তু তাহার মধ্যেও যখন কংগ্রেসে, Arms Aot ও সখের সৈনিক সম্বন্ধে রেজলিউশন্ পাস হয়, তখন প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠে! সুতরাং এহেন বঙ্গবীরের নিকট এমন কবুল জবাব পাইয়া কেহই মনে করিবেন না যে, আমি সশরীরে "হেনিরি মার্টিন্" হাতে লইয়া অশ্ব বা গজারোহণে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য দিব্য সুন্দর গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমি একটা ব্যাঘ্র শিকার দেখিয়াছিলাম, তাহারই বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব।

আমি যখন দেরাদুনে থাকিতাম, তখন লোকালয় অপেক্ষা বনজঙ্গলেই বেশী বেড়াইতাম। লোকালয়ে থাকিবার আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একত্র বাস করিতাম, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত আমার মনের কোনও কথাই মিলিত না। এ অবস্থায় দিনরাত্রি তাঁহাদের সঙ্গে অতিবাহিত করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত, আর সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে আমি বনে জঙ্গলে প্রবেশ করিতাম, এবং দুই চারি দিন নিরুদ্দেশ থাকিয়া আবার এক দিন ফিরিয়া

আসিতাম। যে কয় দিন এই ভাবে বিজন বনে কাটিয়া যাইত, সেই সময়ে নানাপ্রকার বিপদেও পড়িতে হইত। অনেক সময়ে আশ্রয়-অভাবে একাকী বৃক্ষতলে রজনী অতিবাহিত করিতে হইত; কখনও বা দয়াবান্ গৃহস্থের গৃহে অতিথি হইতাম। এ সময়ে আমি সচরাচর ভদ্র-লোকের মতই বেড়াইতাম; সে সময়ে আমাকে দেখিয়া কাহারও সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কখনও বা বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতী, জামা ও শীতবস্ত্র পরিধান করিয়া এই অনতিদীর্ঘ প্রবাসে যাত্রা করিতাম; কখনও বা পেণ্টুলেন, কোট, মেকিন্‌টস্ ও টুপী লইয়া বাহির হইতাম। এখানে বলিয়া রাখি, আমার এই শেষোক্ত পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাকে সাহেব বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও কারণ ছিল না; কেননা, এই ময়ূরপুচ্ছরাশির মধ্য হইতেও আমার ঘন-কৃষ্ণবর্ণ আমার দাঁড়কাকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিত।

এই রকমের এক পোষাক পরিয়া একদিন অপরাহ্নকালে আমি আমার বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। আমি যখন কোথাও ২।১ দিনের জন্য যাইতাম, তখন প্রায়ই, বাসায় না হউক, পাড়ার দুই চারি জন লোককে বলিয়া যাইতাম। এবারে বহুদূরে যাইবার অভিপ্রায় ছিল না; এমন কি, সেই দিনেই ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াই বাহির হইয়াছিলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে আমার এক-জন গুর্‌খা বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুটি ইংরাজী জানেন, তাঁহার নাম মাষ্টার রাধাকিষেণ। তিনি হঠাৎ আমাকে তাঁহার গৃহদ্বারে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কারণ, সেই দিন বেলা একটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একত্রে ছিলাম; তাঁহার বাড়ীতে যাইব, এ কথা তাঁহাকে বলি নাই। কখন কোথায় যাইব, তাহা আমারই ঠিক থাকিত না।

মাষ্টারের বাড়ীতে প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে কতকদূর পর্য্যন্ত আসিলেন। আমি সহরের দিকে ফিরিতেছিলাম, একটা শুষ্ক নদীর ধারে আসিয়া তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। নদীর অপর পারেই রাস্তা, কিন্তু নদীর ঠিক মাঝখানে গিয়াই আমার মতিও ফিরিয়া গেল। তখনও বেলা প্রায় দেড় ঘণ্টা আছে। সহরের রাস্তায় না যাইয়া আমি বাম দিকে গমন করিতে লাগিলাম। নদীর মধ্য দিয়া পথ; জঙ্গল নাই, দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বত। কোথায় যাইতেছি, তাহার ঠিকানা নাই, অথচ চলিতেছি। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ যেখানে সন্ধ্যা হইবে, সেই স্থানেই অবস্থান। তবে বিশ্বাস ছিল যে, নিকটেই গ্রাম মিলিবে।

যখন সন্ধ্যা আসিল, তখন নদীগর্ভ ত্যাগ করিয়া আমি জঙ্গলপথে প্রবেশ করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে নদীতীরস্থিত দুই তিন খানি গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এখন জঙ্গলপথের দুই পার্শ্বে আর গ্রামের চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। একটু অগ্রসর হইয়াই একটি সরু পথ পাইলাম। জঙ্গলে যখন পথ পাইয়াছি, তখন লোকালয় নিশ্চয়ই পাইব। এই ক্ষুদ্র পথ দিয়া যে লোক যাতায়াত করে, পথের অবস্থা দেখিয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু পথ আর ফুরায় না। ক্রমে পথ চড়াইয়ের দিকে যাইতে লাগিল; রাত্রির অন্ধকারও ঘনীভূত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ক্রমেই তাল পাকাইতে লাগিল; অতি কষ্টে পথের রেখা দেখিয়া দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনুষ্যবসতি আর দেখিতে পাই না; বিশেষতঃ, দূরে লোকালয় থাকিলেও, এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহা দৃষ্টিগোচরই বা হইবে কি করিয়া? একবার মনে করিলাম, এক স্থানে

দাঁড়াইয়া চীৎকার করি ;—যদি নিকটে কোনও গ্রাম থাকে, তাহা হইলে কেহ না কেহ সাড়া দিবে। আবার মনে করিলাম, যে পথে আসিয়াছি, সেই পথে চলিয়া যাই। কিন্তু মাষ্টার রাধাকিষেণ বলিয়াছিলেন যে, আজ কয় দিন হইতে নদীর মধ্যে বড়ই ভালুকের উপদ্রব হইয়াছে। তখন সেই কথা মনে হইয়া ফিরিয়া যাইতে সাহস হইল না। অদৃষ্টে যাহাই থাক্, অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্থির করিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সেই সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পথ ক্রমে উপরের দিকে যাইতেছিল। কতকদূর যাইয়া এক স্থানে একটা মোড় পাইলাম। সেই মোড় ফিরিয়া দেখি, ঠিক্ আমার মাথার উপরে একখানি বাড়ী, এবং সেই বাড়ীর একটি ঘর হইতে আলোক বাহির হইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং বাহিরে কাহাকেও না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। আমার কণ্ঠরব শুনিয়া একজন বর্ষীয়সী ঘরের বাহির হইলেন, এবং আমি কি চাই, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি সেই রাত্রির জন্য তাঁহাদের কুটীরে থাকিতে চাই ; আহারাদির আবশ্যক নাই, তাহাও জানাইলাম। গৃহস্বামিনী 'মণিয়া' বলিয়া ডাকিতেই গৃহমধ্য হইতে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি স্থূলকায়া বালিকা বাহির হইয়া আসিল। গৃহস্বামিনী অনুচ্চস্বরে তাহাকে কি বলিলেন, সে অবিলম্বে গৃহে প্রবেশ করিয়া একখণ্ড প্রশস্ত মৃগচর্ম্ম আনিয়া কুটীরের দাবায় পাতিয়া দিল ; গৃহস্বামিনী আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। এতটা পথ হাঁটিয়া ও সন্ধ্যার সময়ে আশ্রয় না পাইয়া আমি একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, সেইজন্য বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল। জল প্রার্থনা করায় গৃহস্বামিনী একটা পরিষ্কার লোটায় করিয়া শীতল জল আনিয়া দিলেন। তৃষ্ণা দূর করিয়া তাঁহাদের পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলাম।

গৃহস্বামিনী দ্বারের নিকট বসিয়া বলিলেন, তাঁহার স্বামী ও পুত্র বাঘ মারিতে গিয়াছেন, তিনি ও কন্যাটি ঘরে রহিয়াছেন। দেরাদুনের স্বনামখ্যাত Captain Hearsy সাহেবের নাম অনেকেই অবগত আছেন। সেই গৃহস্বামী ও তাঁহার পুত্র সেই সাহেবের নিযুক্ত শিকারী; হার্সি সাহেব মৃগাজিন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও পাখীর পালকের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার নিযুক্ত অনেক শিকারী ছিল। তাঁহারই এক শিকারীর গৃহে আমি অতিথি। এই শিকারীরা নানা উপায়ে ব্যাঘ্র শিকার করিত,—কখনও বা বন্দুকের দ্বারা, কখনও বা বল্লমের দ্বারা। তাহারা যখন শিকার করিতে যাইত, তখন তাহাদের সঙ্গে নানাপ্রকারের অস্ত্র থাকিত, এবং তাহারা এক একটি লণ্ঠন সঙ্গে লইত। আমি সে দিন যে ব্যাঘ্র-শিকার দেখিয়াছিলাম, তাহা এইপ্রকার লণ্ঠনের সাহায্যে। এ প্রকারে ব্যাঘ্র শিকারের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম;—আমাদের দেশের মালদহ জেলার কোনও কোনও শিকারী গৌড়ের জঙ্গলের মধ্যে এমনই করিয়া নাকি অনেক ব্যাঘ্র শিকার করিত।

গৃহস্বামিনী আমাকে ক্লান্ত দেখিয়া আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অতিথি হইবার সময়ে যে, আহারের আবশ্যক হইবে না বলিয়াছিলাম, তাহা ভদ্রতার অনুরোধে; তখনই আমার যথেষ্ট ক্ষুধার সঞ্চার হইয়াছিল। তবে তাহারা যদি সে রাত্রিতে কিছু খাইতে না দিত, তাহা হইলে যে বিশেষ কষ্ট হইত, তাহা নহে। গৃহস্বামিনীর অনুরোধে দুই একবার অস্বীকার করিয়া শেষে স্বীকার করিলাম। তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে আমার আহারের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের আয়োজনের রকম দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, তাঁহারা মনে করিয়াছেন, আমি স্বহস্তে রুটী বানাইয়া খাইব। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, স্বহস্তে কিছুই করিতে পারিব না। তাঁহারা

দয়া করিয়া দুইখানি রুটী বানাইয়া দিলে, তাহা গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি হইবে না।" গৃহস্বামিনী অতি বিনীত স্বরে বলিলেন, পাছে তাঁহাদের প্রস্তুত দাল-রুটী আমি না খাই, এই ভয়েই তাঁহারা আমার রান্নার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, নতুবা অতিথির জন্য রন্ধন করিতে তাঁহারা কাতর নহেন। আরও বলিলেন যে, যদিও তাঁহাদের অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে, কিন্তু অতিথি আসিলে তাঁহারা কখনও ফিরান না; ঘরে যাহা থাকে, তাহা দিয়াই অতিথির সেবা করেন। তবে আমি "আমীর লোক," আমাকে তাঁহারা কি খাইতে দিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। আমার পোষাক দেখিয়াই তাঁহারা আমাকে আমীর স্থির করিয়াছিলেন। আমি যে আমীর-ওমরাহ কিছুই নহি, তাঁহাদেরই মত দরিদ্র গৃহস্থ-সন্তান, অতি বিনয়ের সহিত তাহা বলিলাম, এবং তাঁহাদের কুটীরে তাঁহারা আমার আহারের জন্য যাহা দিবেন, তাহা পরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিব, এ কথাও নিবেদন করিলাম।

তাহার পর তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে ঘরের মধ্যে আহার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেয়েটি বারান্দায় আসিয়া জঙ্গলপথের দিকে চাহিয়া আবার ঘরের মধ্যে যাইতে লাগিল। তাঁহারা শিকারীদিগের আগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি কুটীরের ক্ষুদ্র বারান্দায় প্রশস্ত মৃগচর্ম্মে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় কখনও বা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, কখনও বা ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার থেই হারাইয়া সেই অন্ধকার বনস্থলীর গম্ভীর প্রশান্ত শোভা দেখিতে লাগিলাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ; তাহারই মধ্যে থাকিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনশীল পক্ষীর পক্ষসঞ্চালন-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। নিকটে বোধ হয় কোনও নির্ঝর ছিল না, আর থাকিলেও তাহার শব্দ তেমন অধিক নহে; নতুবা এমন শব্দহীন সময়ে অবশ্যই নির্ঝরের কুল কুল শব্দ শুনিতে পাইতাম।

আমি সেই পর্ব্বতমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরের বারান্দায় বসিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

শিকারীর ঘরের দাবায় বসিয়া আমি চিন্তাতে নিমগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে সেই বালিকাটি আমার গায়ে হাত দিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। বালিকা বলিল, সে আমাকে দুই তিন বার ডাকিয়াছে, কিন্তু আমি কোন স্যাড়া না দেওয়ায় সে আমার গায়ে হাত দিয়াছে। সে বলিল, দূরে ঐ যে একটা আলোক দেখা যাইতেছে, ঐ আলোক লইয়া তাহার বাবা ও দাদা আসিতেছে। আজ তিন দিন হইল, এই পাহাড়ে একটা বাঘ আসিয়াছে; তাহারা এই তিন দিন ধরিয়া সেই বাঘের অনুসন্ধান করিতেছে। আজ আলোটি যেপ্রকার নাচিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, তাহারা বাঘ পাইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাঘ কি তাহারা মারিয়া আনিতেছে?" আমার কথা শুনিয়া বালিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল যে, তাজা বাঘ আসিতেছে; বাঘটি সে অথবা তাহার মা মারিবে। এই কুটীর-প্রাঙ্গণেই বাঘ মারা পড়িবে। তাহাদের কথা শুনিয়া আমি অবাক্! তের বৎসরের মেয়ে বলে কিনা, সে বাঘ মারিবে! যাহা হউক, একটু পরে সমস্তই দেখিতে পাইব।

এদিকে আলো ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ঠিক্ যেমন আলেয়ার আলো মাঠের মধ্যে নাচিতে থাকে,—কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, এই আলোটিও ঠিক সেইপ্রকার। আমার কলিকাতাপ্রবাসী বন্ধুগণ বোধ হয় কখনও বড় বড় মাঠের মধ্যে আলেয়ার আলো দেখেন নাই। আমরা মফঃস্বলবাসী লোক, এপ্রকার আলো অনেক দেখিয়াছি। বোধ হয়, যেন মাঠের মধ্যে কে আলো জ্বালিতেছে ও নিবাইতেছে, কখনও বা আলো হাতে লইয়া দৌড়িতেছে। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা ইহা অপদেবতার কাজ বলিয়া মনে করে, এবং

এপ্রকার মনে করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। এই আলোর একটি গুণ আছে যে, এই আলোর দিকে চাহিলে চক্ষু কেমন ঝলসিয়া যায়; অনেকে পথহারা হইয়া যায়। সেই জন্য অশিক্ষিত লোকেরা বলে যে, এই আলোর সাহায্যে পথ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া অপদেবতারা পথিকদিগকে মারিয়া ফেলে। সে কথা এখন থাকুক।

আলো নিকট হইতে দেখিয়া মা ও মেয়ে উভয়েই বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। দুই জনের পাশেই তিন চারিটি করিয়া বল্লম; তাহারই এক একটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া তাঁহারা বসিয়া রহিলেন। আলোকধারী ব্যক্তি যখন ঠিক্ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার সঙ্গী এক লাফে বারান্দায় উঠিয়া এক গাছা বল্লম ধরিয়া বসিল। কিন্তু যখন দেখিল, মেয়েটি ও তাহার মা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, তখন সে দৃঢ়স্বরে বলিল,—"মণিয়া! লাগাও।" ঠিক সেই সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ প্রাঙ্গণে উপস্থিত। আলোকধারী ব্যক্তি প্রাঙ্গণ হইতে অপর পার্শ্বে নামিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বালিকার হস্তনিক্ষিপ্ত বল্লম "বোঁ" করিয়া গিয়া একেবারে বাঘের চোখে লাগিল, এবং মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হইয়া পড়িল, ব্যাঘ্রবর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া এক লম্ফ প্রদান করিল, এবং পরক্ষণেই একেবারে ধরাশায়ী হইল। আমি সে সময়ে কুটীরের দেওয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া; আর এতদিন পরে বলিতেই বা লজ্জা কি, আমি কম্পিতকলেবর। ব্যাঘ্র পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া সকলে ছুটিয়া গেল। যে লোকটি পূর্ব্বে বারান্দায় উঠিয়াছিল, সেইটি ছেলে; এবং আলোকধারী ব্যক্তিই গৃহস্বামী। আমিও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এক প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র!

তাহারা তখন ব্যাঘ্রকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই বারান্দায় আসিয়া বসিল। তখন গৃহস্বামিনী আমার পরিচয় প্রদান করিলেন। গৃহস্বামী

আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিল। তাড়াতাড়ি ধূমপান করিয়া তখনই ব্যাঘ্রটিকে টানিয়া প্রাঙ্গণ হইতে দূরে লইয়া গেল, এবং পিতাপুত্রে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাহার চামড়া ছাড়াইল। তাহারা যখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন আমি তাহাদের কুটীরের বারান্দায় নিদ্রিত।

পরদিন প্রত্যূষে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, এবং বন্ধুগণের নিকট এই আশ্চর্য্য ব্যাঘ্র শিকারের গল্প করিলাম। আমার পরম শ্রদ্ধেয় কা—বাবু বলিলেন যে, তিনি ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য শিকারের কথা Hearsy সাহেবের নিকট শুনিয়াছেন। তিনি দুই চারিটি গল্প করিলেন, কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

বাঘের ঘরে অতিথি।

আমি কার্য্যোপলক্ষে শ্রীনগর হইতে তিহরীর পথে যাইতেছিলাম। গাড়োয়ালের রাজা শ্রীনগর হইতে তিহরী যাইবার যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সে পথের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রাজপথ শুনিয়া যাঁহারা কলিকাতা, দিল্লী, লাহোরের রাজপথের কথা মনে করিবেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, সে রাজপথ এমন সুপ্রশস্ত যে, দুইটি মানুষ বিভিন্ন দিক্ হইতে আগত হইলে, এক জনকে পর্ব্বত গাত্র ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে হয়, নতুবা অপর ব্যক্তির যাওয়া কষ্টকর। এই পথে এক দিন অপরাহ্ণ কালে আমি পথিক। মধ্যাহ্নকালে এক বৃক্ষ-তলে অতিথি হইয়াছিলাম। সঙ্গে পর্ব্বতবাসী দৃঢ়কায় এক ব্রাহ্মণ-প্রবর পথপ্রদর্শক ছিলেন; তিনি আমার একাধারে সব—পাচক, ভৃত্য, পথপ্রদর্শক, কথার দোসর। সেই পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণের নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষতলে "দাল আউর রুটি বানায়কে" মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করা গিয়াছিল। তাহার পর উভয়ে বৃক্ষতলে ভূমি-শয্যায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় যাত্রা করা গেল। এই স্থানে একটা কুসংস্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পাঠক-গণের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। এই বিংশ শতাব্দীতে "হাঁচি টিক্‌টিকির" উপর অনেক বাক্যবাণ-বর্ষণ হইয়া থাকে; এসব জানিয়াও আমি তেমনি একটা ব্যাপারের কথা বলিতে যাইতেছি। যাত্রা করিবার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়াছি, তখন প্রথমেই আমার হাতের লাঠিখানি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন দৃঢ় সুন্দর যষ্টি, আমার পর্ব্বতভ্রমণের অদ্বিতীয়

সহায়, আমার নিবিড় অরণ্যের একমাত্র সহচর, আমার সুখ-দুঃখের একমাত্র অবলম্বন, আমার সন্ন্যাসিজীবনের প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কথা নাই, বার্ত্তা নাই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রিয়তম চোরেরা যেমন এক এক জন এক এক দিন না বলিয়া না কহিয়া হৃদয় আঁধার করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তেমনি আমার এই অরণ্য-বাস-সহচর যষ্টিখণ্ডও—অসময়ে এই বনপ্রান্তে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আমি কিছু অপ্রসন্ন হইলাম, কিন্তু নিরুপায়। জীর্ণ বস্ত্রের মত যষ্টিখণ্ডদ্বয় পাহাড়ের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। কে জানে, হয় ত কোন দিন, কোন পথিক আমার এই দেহটিকেও এমনি জীর্ণ বস্ত্রের মত পথের মধ্য হইতে সরাইয়া দিবে। তখন আমি সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছিলাম। পার্ব্বত্যপথে আর সমস্ত জিনিস না হইলেও চলে, কিন্তু হাতে একখানি লাঠি থাকা চাই। চড়াইয়ে উঠিবার সময় একখানি লাঠি তিনখানি পায়ের কার্য্য করে। কি করি, সঙ্গী পাহাড়ীর লাঠিখানি নিজে লইলাম, সে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া চলনসই-রকম একখানা লাঠি করিয়া লইল। সবে দুই তিন পা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে, কি করিয়া বলিতে পারি না, আমার পায়ে কম্বল জড়াইয়া গেল, আর আমি একেবারে ভূমিসাৎ! এমন পড়িয়া গেলাম যে, যদি সে স্থান কোন একটা চড়াই বা উৎরাইয়ের স্থান হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সন্ন্যাস-বাদ্য শেষ হইয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে স্থানটি তেমন উঁচু নীচু ছিল না; ততোধিক সৌভাগ্য যে, আমার পথপ্রদর্শক অতি নিকটেই ছিল, সে তাড়াতাড়ি আমাকে টানিয়া তুলিল। হাতে সামান্য একটু আঘাত লাগিয়াছিল, মাথায়ও লাগিয়াছিল, তাহা তখন তেমন বুঝিতে পারি নাই। অকস্মাৎ লাঠি ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা অপেক্ষাও আমার মত একজন পর্ব্বতভ্রমণ-নিপুণ জোয়ান একেবারে 'পপাত ধরণীতলে' দেখিয়া পথপ্রদর্শক এবেলা যাত্রা করিতে নিষেধ

করিল। এমন প্রবল দুইটি বাধা ঠেলিয়া এ অপরাহ্নকালে পথে বাহির হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, এ কথাও সে বলিল। আমি ইংরাজী পড়িয়াছি, বিজ্ঞানের ধার ধারি, সাহেবদের কলেজের ছাত্র, উন্নতিশীল যুবক, আমি এই পর্ব্বতের মধ্যে বাধা মানিয়া কি ইংরাজী লেখা পড়ার মুখ হাসাইব? যদি এখন দেশে ফিরিয়া গিয়া এই গল্পটি করি,—বলি যে, একটি পাহাড়ীর কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া আমি এক বেলা অকারণে গাছের তলায় অনাহারে পড়িয়াছিলাম, তাহা হইলে আমার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ যে, আমাকে নিতান্ত বর্ব্বর মনে করিবেন! Huxley, Tyndall, Herbert Spencer প্রভৃতি পড়িবার কি এই ফল হইবে? এইরকম সাত পাঁচ ভাবিয়া সঙ্গীকে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলাম, এ সব কিছুই নহে, এমন করিয়া বাধা মানিয়া চলা ফেরা করিলে, চাই কি, জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন এই গাছের তলাতেই কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতই তাহাকে বুঝাই, সে সেই একই কথা বলে,—"দোনো বাধা ঠেল্‌কে জানা মুনাসিব নেহি।" শেষে আমি যখন কৃতনিশ্চয় হইলাম, তখন বেচারী আর কি করে, "বাবুজীকো অদৃষ্টমে ভগবান্ বহুত কষ্ট লিখা," এই ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া সে নিতান্ত অপ্রসন্নমনে আমার অনুগমন করিল, এবং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি কিন্তু বাধার কথা আর ভাবিলাম না।

সঙ্গীকে ধীরে ধীরে আসিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে চলা আমার পোষাইয়া উঠিল না। সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে কোথায় থাকিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। সে বলিল, ঐ স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তার বাম পার্শ্বে একটা পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী আছে; সেখানে দোকান আছে; সেখানেই আমরা আজ রাত্রি বাস করিব। সে দোকান ছাড়িয়া গেলে, আর দশ মাইলের মধ্যে থাকিবার স্থান নাই;

আর রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—"বরাবর সিধা সড়ক।" সুতরাং পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চলিবার আবশ্যকতা আর অনুভব করিলাম না। আমি ক্রমেই দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম, সঙ্গীও ক্রমে পশ্চাতে পড়িতে লাগিল।

সেই বেলা চারিটার সময়ে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছি; এখন সূর্য্য অস্ত যায় যায় হইল। রাস্তারও শেষে দেখি না, পথিপার্শ্বে সে পাথরের ভাঙ্গা বাড়ীও দেখি না। আর এত পথ চলিয়াছি, ইহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর, কি একজন মানুষ, কিছুই দেখিতে পাই নাই। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সেই অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র সেই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, কখনও বা একটু বেশী প্রসর হইতেছে, কখনও বা অতি কষ্টে পথের রেখা বাহির করিতে হইতেছে। রাস্তার যে-প্রকার অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, অনেক দিন তাহার অদৃষ্টে মনুষ্যের পদস্পর্শ ঘটে নাই।

খুব কম হইলেও দ্রুতপদে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল পথ চলিয়াছি; ইহার মধ্যেও কি পাঁচ মাইল পথ চলিতে পারি নাই! সন্ধ্যা আগত দেখিয়া এই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল। তাহা হইতেই পারে না। আমার মনে হইল, যেপ্রকার তাড়াতাড়ি চলিয়াছি, তাহাতে পাঁচ মাইল কেন, পাঁচ ক্রোশ পথ আমি অতিক্রম করিয়াছি। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না,—আমি এই জনহীন হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে পথ হারাইয়াছি। আর এখন স্বীকার করিতেই বা লজ্জা কি, তখন বার বার মনে হইতে লাগিল, 'বাধা' না মানিয়া আসিবার ফল ত হাতে হাতে ফলিল। দেশে আমাদের বাড়ীতে একজন বৃদ্ধ মুসলমান চাকর ছিল; সে যখন-তখনই বলিত, "যে না মানে

বাধা, সে বড় গাধা" ; এই জঙ্গলের মধ্যে সেই কথা মনে হইল ; সঙ্গী পাহাড়ীর সেই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল,—"বাবুজীর অদৃষ্টে ভগবান্ আজ অনেক কষ্ট লিখিয়াছেন।

এখন এই জনহীন নিবিড় অরণ্যে কি করি? যদি প্রাণ যায়, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ ত তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, আর রাত্রিকালে হিংস্রজন্তু আমাকে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলুক। সংসারের উপর, জীবনের উপর, হাজার বীতস্নেহ হইলেও, তাহা পারা যায় না ; সুতরাং একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। সময় বুঝিয়া সন্ধ্যার আকাশে মেঘ উঠিল ; একেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বনের মধ্যে অন্ধকাররাশি এক এক স্থানে জমাট বাঁধিতেছিল, তাহার উপর আকাশে মেঘ হওয়ায় তাহারা আরও ঘন হইতে লাগিল ; আমারও বিপদ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের মেঘ সবুর সয় না। এই আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই ; হঠাৎ পাহাড়ের কোন্ কোণে একখণ্ড মেঘ চুপ করিয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইল ; গাছ ভাঙ্গিল, পাতা উড়াইল, ধূলি-কঙ্করে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, বৃষ্টি হইল, শিলাবৃষ্টি হইল। আবার দশ পনের মিনিটের পরেই যেমন হাসি মুখ, তেমনি। একে পথ হারা ; সঙ্গী কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই ; তাহার উপর বেলা বারটার সময়ে যে দাল রুটী খাইয়াছিলাম, তাহা কখন হজম হইয়া গিয়াছে ; তাহার পর সন্ধ্যা আগত ; ইহাতেও যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, সুতরাং এই অন্ধকারকে আরও ভীষণ করিবার জন্য আকাশে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি। মড়্ মড়্ করিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, এইবারে একটা প্রকাণ্ড ডাল মাথায় পড়িয়া আমাকে একে-

ধারে পিষিয়া ফেলিবে। আমি একটা পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া বসিলাম; সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই বৃষ্টি থামিয়া গেল, ঝড় কিন্তু শীঘ্র গেল না। বৃষ্টি অপেক্ষা ঝড়ই বেশী হইয়াছিল।

এপ্রকার স্থানে বসিয়া থাকিয়া কোন ফলই নাই ভাবিয়া, যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলাম; যদি আমার চীৎকারধ্বনি সঙ্গীর অথবা অন্য কোন লোকের কর্ণে পৌঁছে, তাহা হইলেও এই অন্ধকার রাত্রিতে আমার আশ্রয় মিলিতে পারে। কেহই কোন উত্তর দিল না, কেবল সেই ঘনান্ধকারপূর্ণ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আমার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। একটু অগ্রসর হইয়াই একটা বেশ পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান দিয়াই চলিয়া গিয়াছি; কিন্তু যাইবার সময়ে এদিকে তত লক্ষ্য করি নাই। এই স্থানে পর্ব্বতের গাত্র হইতে একটা নির্ঝর পতিত হইতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে একটা গুহা। অন্ধকারে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিলাম, গুহাটি পরিষ্কার বটে। তবে অল্পক্ষণ পূর্ব্বের ঝড়ে অনেকগুলি শুষ্ক পত্র গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। আরও দেখিলাম, গুহার বাহিরে অনতিদূরে বড় বড় তিন চারিটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে। অনেক কষ্টে সেই কাষ্ঠ কয়েকখানি গড়াইয়া গড়াইয়া গুহার মুখে আনিয়া বসাইলাম। তাহার পর গুহার মধ্যে যে শুষ্ক পত্র ছিল, সমস্তগুলি সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলির সম্মুখে স্তূপাকার করিলাম। আহার আর কি করিব? অঞ্জলি পূরিয়া নির্ঝরের জল পান করিলাম। তাহার পর দুই খানি ছোট ছোট 'চির' কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম, কিছু ক্ষণ পরেই তাহা হইতে অগ্নি বাহির হইল। এতক্ষণ আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই; কারণ, বাহিরে যতটা অন্ধকার হইয়াছিল,

গুহার মধ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যখন শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিলাম, তখন দেখিলাম, গুহাটি নিতান্ত ছোট নহে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম ইহা কোন হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান। আজ আমি তাহারই গৃহে অতিথি।

উপায়ান্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং বড় বড় কাষ্ঠগুলি এমন করিয়া গুহাদ্বারে সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলাম যে, বাহির হইতে সহজে আর কেহ ভিতরে আসিতে না পারে। বিশেষতঃ গুহার মধ্যভাগ যেমন প্রশস্ত, প্রবেশদ্বার তেমন নহে। বড় একটা ব্যাঘ্র, কি ভালুক, গুঁড়িসুড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু ভিতরে আমি অনায়াসে দৌড়াইতে পারিয়াছিলাম। গুহা এইপ্রকার সঙ্কীর্ণমুখ হওয়ায় আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল; কারণ, আমি যে আগুন জ্বালাইয়াছিলাম, তাহাতে সেই সঙ্কীর্ণ গুহাপথে আর কাহারও প্রবেশের যো ছিল না।

এই প্রকারে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, মনে নাই। হঠাৎ একটা শব্দে আমি যেন জাগিয়া উঠিলাম। আমি যে ঘুমাইয়াছিলাম, তাহা নহে; গুহার মধ্যে কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতেছিলাম। শব্দটি নির্ঝরের দিক্ হইতে আসিয়াছিল। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন জন্তু যেন জিহ্বা দ্বারা চক্ চক্ করিয়া জল খাইতেছে। তাহার অব্যবহিত পরেই দেখি, প্রকাণ্ডকায় একটা বাঘ গুহার সম্মুখে আসিয়া বসিল; বোধ করি, আগুন জ্বালিয়াছিলাম বলিয়া নিকটে আসিতে পারিল না। দূরে পশ্চাতের দুই খানি পায়ের উপরে বসিয়া একদৃষ্টে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাঘ্র মহাশয়ের দীন নয়ন দেখিয়াই বুঝিলাম, এ গৃহ তাঁহারই। আমি আজ

তাঁহাকে বেদখল করিয়া রাজগৃহে অতিথি। এমন অতিথি সে তাহার ব্যাঘ্রজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কখনও দেখে নাই। তাহার মহতী রাজ-শক্তির এমন অবমাননাও তাহার জীবনে কখনও হয় নাই। কিন্তু কি করে? আজ স্বয়ং ব্রহ্মা ক্ষুদ্র মানবের সহায়; নতুবা এতক্ষণ এমন ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল অভ্যাগতের জন্য সে অতি নিরাপদ স্থানে চির আতি-থ্যের বন্দোবস্ত করিত।

এইপ্রকার রজনীতে সহরের মধ্যে তোমাকে যদি কেহ তোমার বাড়ী হইতে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া নিজে দখল করিয়া বসে, তাহা হইলে, তুমি যে দুর্ব্বল বাঙ্গালী, তুমিও কি অন্ততঃ তোমার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হস্তখানি একবারও মুষ্টিবদ্ধ কর না? ব্যাঘ্র বনের রাজা; সে সকলের মাথা খাইয়াছে, নিজের মাথা কাহারও নিকট অবনত করে নাই। আজ এই গভীর নিশীথে, এই অন্ধকারে, তাহাকে গৃহচ্যুত করিয়া জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়াটা সে সহজেই পরিপাক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে এমন এক গর্জ্জন করিয়া দণ্ডায়মান হইল যে, আমার বোধ হইল, সে নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য বুঝি এই অগ্নি-কুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে; কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে মানুষের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ দেখিলাম। তুমি আমি হইলে এই ভদ্রাসন দখলের জন্য যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিয়া শেষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও তরুতলে রাত্রি যাপন করিতাম। ব্যাঘ্র মহাশয় সেপ্রকার কিছু না করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হয় ত পরদিন একবার এই অতিথির সঙ্গে বোঝা-পড়া করিবার মতলব আঁটিতে আঁটিতে সে সমস্ত রাত্রি বনের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল। পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আসিয়া সে হয় ত দেখিয়াছিল যে, তাহার অতিথি প্রকৃতই অতিথি; দ্বিতীয় তিথি পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত হয় ত সেই ব্যাঘ্র আকাশে মেঘ দেখিলেই আগে ছুটিয়া আসিয়া নিজ গৃহদ্বার জুড়িয়া বসে! কিন্তু সে কথার পরীক্ষা করিতে যাইবার আর আমার অবকাশ হয় নাই। এক রাত্রি বাঘের ঘরে অতিথি হইয়া আসিয়াছি। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে তোমার বাড়ী অতিথি হইতে গেলে তুমি তাড়াইয়া দিতে, কিন্তু বনের বাঘ সমস্ত রাত্রি নিজের বাসগৃহ ছাড়িয়া দিয়া অতিথিসেবা করিয়াছিল! কি স্বার্থত্যাগ!

হিমালয়ের স্মৃতি।

হিমালয়ের স্মৃতি।

অনেক দিন পরে আজ আবার নূতন করিয়া হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিলাম। বঙ্গের এই সমতল ভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ম্মকঠোর জীবনের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য মস্তকে বহনপূর্ব্বক অন্ধ আবেগে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছি; সুখ, আশা, পরিতৃপ্তি কিছু নাই; তথাপি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেতকীকুসুমের সৌরভাকুল ভ্রমরের ন্যায় সংসারের ধূলায় অন্ধীভূত আঁখি লইয়া ক্রমাগত কণ্টকাঘাত সহ্য করিতেছি; পক্ষদ্বয় ছিন্ন, বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত; হৃদয়ে আর সে সাহস, সে বিশ্বাস নাই; মনের সে বল, অনন্ত দেবতার করুণায় তেমন অসীম নির্ভরের শক্তি নাই। তাই আজ জীবনের অবসানে, নিদারুণ-ক্লান্তিনিপীড়িত বক্ষে, হতাশভাবে একবার চাহিয়া দেখিতেছি— কোথায়, কতদূরে আমার শান্তিসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; আমার জীবনের সেই নিষ্কাম সাধনা কোন্ দেবতার পদতলে চির দিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর ন্যায় কতকগুলি পুত্তলিকা লইয়া পুতুল খেলিতে বসিয়াছি! আষাঢ়ের এই নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে; ধরাতল বর্ষার সলিলে সিক্ত প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত; নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতেছে; শ্যামলা ধরণীর বিস্তীর্ণ বসনাঞ্চলের ন্যায় ধান্যভূষিত ক্ষেত্র; জল ও স্থল অপূর্ব্ব সুষমায় সমাচ্ছন্ন। মনে হয়, কতযুগ পূর্ব্বে এমনই একদিনে ভারতের অমর কবি রামগিরিতে নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের হৃদয়বেদনা অশ্রুময়ী ভাষায় সুপ্রকাশিত করিয়া প্রত্যেক প্রবাসী বিরহীর অপূর্ণ কামনা দ্বারা তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন দিনে, এমন ঘনঘোর বর্ষার মধ্যে আমার বিরহিহৃদয়ের যে সুপ্ত বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা শান্ত করিবার জন্য, আমার সেই চিরদুঃখের অচল দেবতা হিমালয়ের পবিত্র স্মৃতি-চর্চ্চাই একমাত্র মহৌষধ। তাই একবার সংসার ভুলিয়া—মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহাদিগকে দুদিনের জন্য আপনার ভাবিয়া প্রতিপদে জটিলতর ভ্রান্তিজালে বিজড়িত হইতেছি—তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, একবার সেই অতীত জীবনের সুমধুর কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে কাহারও হৃদয়ে আনন্দ বা তৃপ্তি দান করিতে পারিব, সে আশা নাই। সে সম্ভাবনাতেও অতীত কথার আলোচনা করিব না। মানুষ পৃথিবীতে নিজের তৃপ্তির জন্যই ব্যাকুল; অন্যে যখন ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পথে আসিয়া পড়ে, তখন সে তাহাকে সঙ্গিরূপে গ্রহণ করিয়া ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে কুহকমন্ত্র সে অপরের হৃদয়াকর্ষণের জন্য প্রয়োগ করে, কখন কখন তাহা ছিন্নতার বীণার তানলয়হীন ধ্বনির ন্যায় শ্রুতিকঠোর হয়। যে বীণার সহায়তায় আমার আকাঙ্ক্ষাপীড়িত হৃদয়ের হাহাকার সঙ্গীতরূপে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিলাম, সে বীণা আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে আগ্রহ, সে আন্তরিকতা আমার নাই; কেবল দগ্ধস্মৃতির অন্তর্জ্বালা সেই বহুদূরান্তর-ন্যস্ত হিমাচলের বৃক্ষলতাবর্জ্জিত, ধূসর, অপরিবর্ত্তনীয়, চির-উদাসীন প্রস্তরস্তূপের ন্যায় বক্ষের মধ্যে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাতে অশ্রু শুকাইয়া যায়। কোন্ বলে কবিত্বের অমৃত-উৎস উৎসারিত করিব?

আমার সেই বহু পুরাতন, পর্ব্বতবাসের চিরসঙ্গী শ্রীভ্রষ্ট ডাইরিখানির পৃষ্ঠা কতদিনের পর আজ নূতন করিয়া খুলিলাম। অনেক দিন ইহা খুলি নাই; কৃপণের ধনের মত অতি যত্নে ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

আজ অতি সন্তর্পণে তাহা খুলিয়া দেখিতেছি—ঐ পেন্সিলে লেখা পথের বিবরণ অপরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত অশোভন হইলেও আমি ইহার ভিতর দিয়া বিশালকায় হিমালয়ের সুবিরাট্ সুপ্রশস্ত সুগম্ভীর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। ইহার প্রতিপত্রে প্রতিছত্রের ভিতর কত সুদীর্ঘ দিবসের অলিখিত কাহিনী, কত নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গ যামিনীর দুঃসহ কণ্টকশয্যার সকরুণ বার্ত্তা আমার অতীত স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে বিকসিত করিবার জন্য মূকভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহা মনে করিলে নানাভাবে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। মনে হয়, এই কি সেই পৃথিবী? দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ কি চিরদিন্ একরূপই থাকে? একদিন যাহা ছিলাম, আজও কি তাহাই আছি? মনুষ্যজীবন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কা'ল যে ধার্ম্মিক ছিল, আজ সে মহাপাপিষ্ঠ; কা'ল যে সন্ন্যাসী ছিল, আজ সে ঘোরতর সংসারী; কা'ল যে পরের সুখের জন্য হাস্যমুখে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিত, আজ সে নিজের সুখের অনুরোধে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে! তবে কে বলিল, পৃথিবীতে দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ চিরদিন সমান? যে রত্নাকর একদিন সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের জন্য নরহত্যায় উন্মুখ হইয়াছিল, সেই রত্নাকর, আর যাঁহার কবিত্বস্রোতে আজ সমস্ত শিক্ষিত জগৎ পরিপ্লাবিত, এবং যে সুধাতরঙ্গে অবগাহন করিয়া কতজন কবি বিজয়ী সাধকের বেশে যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বাল্মীকি, কি একজন? সেই হিমালয়-বক্ষ-বিহারী, লোটা-কম্বলধারী, কপর্দ্দকহীন, উদাসীন, লক্ষ্যহারা সন্ন্যাসী, আর এই সংসারজ্বালা-সংক্ষুব্ধ, বিষয়লিপ্ত, অতিসাবধান, সাধনমার্গ-বিচ্যুত গৃহী, এই উভয় কি একজন? কে জানিত, কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা এই হতভাগ্য গৃহহীন উদাসীন সন্ন্যাসীর জন্য এত সুদৃঢ় পাশ নির্ম্মাণে রত ছিলেন? কিন্তু এজন্য আমি বিধাতাকে অপরাধী করিতে

পারি না। তিনি চিরকরুণাময়; আমার এই উত্তপ্ত মস্তকে তাঁহার চিরমঙ্গলময় আশীর্ব্বাদধারাবর্ষণে তিনি কোন দিন উদাসীন নহেন। আমিই মাতৃ-অঙ্কারূঢ় দুরন্ত শিশুর ন্যায় কতবার তাঁহার স্নেহালিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি। পৃথিবীর ধূলায় দেহ মলিন ও কলঙ্কিত করিয়াছি; তাই এ দুর্দ্দিনে ঝটিকা, বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে অবসাদগ্রস্ত, উৎকণ্ঠিত একক জীবনের শুষ্ক মরুস্তর ভেদ করিয়া উভয় বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারণপূর্ব্বক আবেগভরে সেই মহিমময়ী, অনাথের চিরনির্ভর বিশ্বজননীকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে;
ঠেলিস্‌নে মা ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে।
সারাদিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
কত প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে,
নিরাশ আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে॥"

—কিন্তু যাহার চিত্তে চাপল্যের সীমা নাই, তাহার অনুতাপ অনর্থক!

শ্রীনগর।

হিমালয়ের বহুসংখ্যক উপত্যকা ও অধিত্যকা, চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করিয়া, নগাধিরাজের কত নয়ন-মনোমোহন নগ্নশোভা নিরীক্ষণ করিয়া, ডাইরীর ভিতর দিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সে স্থানের নাম শ্রীনগর। এ ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর নহে; হিমালয়বক্ষে বিস্তীর্ণ, গিরিপাদপ-সমাবৃত গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর। গাড়োয়াল রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত; বৃটিশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়াল। শ্রীনগর এই বৃটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী। বৃটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী বলিলে ঠিক বলা হইল কি না বলা কঠিন; তবে কলিকাতাকে যদি বৃটিশ ভারতের রাজধানী বলিলে অত্যুক্তি না হয়, তাহা হইলে শ্রীনগরকে বৃটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী বলিলেও অন্যায় হইবে না। কারণ-ভারত-রাজ-প্রতিনিধি সুদুঃসহ গ্রীষ্মতাপ প্রশমনোদ্দেশে ও রাজকর্ম্ম সংসাধনার্থ বৎসরের নয়মাস শিমলাশৈলে ও ভারতের বিভিন্ন নগরে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট তিনমাস অতিকষ্টে কলিকাতায় অতিবাহিত করিলেও যেমন কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী, সেইরূপ গাড়োয়াল রাজ্যের বিচারকবর্গ ও বিচারালয়, শান্তিরক্ষণ ও শাসনবিভাগের মুকুটমণিগণের নিকেতন 'শ্রীনগরের কিছু দূরবর্ত্তী একটি মনোরম পার্ব্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত হইলেও, শ্রীনগরই গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। রাজপুরুষগণ কখন কখন অনুগ্রহপূর্ব্বক অবসরকালে শ্রীনগরের সেই সুমোহন পার্ব্বত্যশোভা নিরীক্ষণ করিতে গমন করেন। তাঁহাদের শ্রীনগরে পদার্পণের অন্য কোন আবশ্যকতা দেখা

যায় না; তথাপি শ্রীনগর গাড়োয়ালের রাজধানী। যখন স্বাধীনতায় মহিমময়ী জয়শ্রীতে সমগ্র গাড়োয়াল প্রদেশ উদ্ভাসিত ছিল; যখন গাড়োয়ালের প্রত্যেক বৃক্ষলতা, প্রত্যেক গিরি-নির্ঝর, অরণ্যের প্রত্যেক সুকণ্ঠ বিহঙ্গ আপনার বিজন বনস্থলীতে উপবেশন করিয়া অক্লান্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার গৌরব-গাথা গান করিত; যে দিন গাড়োয়ালের প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গ স্বাধীনতার অটল গৌরবস্তম্ভের ন্যায় সুনীল অম্বরপথে আপনার উন্নত মস্তক প্রসারিত করিয়াছিল,—সে দিন শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রকৃত রাজধানী ছিল। তখন ইহা সমগ্র গাড়োয়াল প্রদেশের দ্যুতিমান্ কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজ করিত; এখনও সযত্নে অতীত শোভার বিলুপ্ত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া মৌনভাবে বিরাজ করিতেছে;— অতীতের সকলই গিয়াছে, কেবল তাহার সুনামের সৌরভ অশ্রান্তগতি কালের চির-কল-তানের সহিত ভাসিয়া আসিতেছে। সুতরাং এখন শ্রীনগরকে রাজধানী নামের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিলে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতির অবমাননা করা হয়। হয় ত সেই জন্যই এখনও শ্রীনগর গাড়োয়ালের রাজধানী। প্রকৃত রাজধানী এখন পাউরীতে, এবং শ্রীনগরের প্রাচীন, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, গৌরব-শ্রীবিভূষিত অট্টালিকারাশির উপকরণ লইয়া পাউরীর সুন্দর সুন্দর শৈলনিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছে। বড়কে ভাঙ্গিয়া ছোট করা, ছোটকে টানিয়া বড় করা বিধাতার কাজ, এ পৃথিবীতে নিরন্তর এ দৃশ্য দেখিতেছি;—ইংরাজ আজ ভারতের বিধাতা, তাঁহারা বড় শ্রীনগরকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া, ছোট পাউরীকে বড় করিয়াছেন। এজন্য আক্ষেপ বৃথা!

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ্রাশি ভেদ করিয়া, কত গিরিনদী, উপত্যকা, কত পার্ব্বত্য জনপদ, তুষারসমাচ্ছন্ন গিরিপ্রান্তর, রৌদ্রদগ্ধ অগ্নিময় বন্ধুর

পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া—শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত হৃদয়ে যে দিন গাড়োয়ালের রাজধানী পূর্ব্বশ্রীহীন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম—সে দিন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন মঙ্গলবার। আমার উদ্দেশ্য, এইবার শ্রীনগর হইতে তিহরী যাইব। পূর্ব্বে একবার যখন শ্রীনগরের ভিতর দিয়া বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলাম, তখন তিহরীর পথে যাই নাই; আমরা হরিদ্বার হইতে বরাবর শ্রীনগরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। পথেরও শেষ নাই, আকাঙ্ক্ষারও বিরাম নাই, তাই এবার আমি এই নূতন পথ ধরিলাম; কিন্তু পথ নূতন হইলেও দেরাদুন গমনের ইহাই ঠিক পথ। শ্রীনগর হইতে দেরাদুন যাইতে হইলে হরিদ্বার প্রদক্ষিণ করিয়া যাওয়া ঠিক নহে, অনেক ঘুরিতে হয়। জীবন যখন শোকতাপে প্রপীড়িত হইয়া ব্যগ্র বাহুদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক মরুভূমির মরীচিকার মোহে শান্তির মৃগতৃষ্ণিকার সন্ধানে ব্যাধশরাহত পিপাসাতুর মৃগের ন্যায় উদ্ভ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়াছিল; কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে নাই; সহস্র বিপদের মেঘমালা মস্তকের উপর ঘনীভূত দেখিয়াও বহুদূরবর্ত্তী লোকালয়ের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই, তখন সেই বক্রপথে পরিভ্রমণে কিছুমাত্র শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না;—কিন্তু এখন সেই শ্মশানের চিতাগ্নি-শিখা ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইতেছে; চিন্তা আসিয়া চিতার স্থান অধিকার করিয়াছে; অবসাদ আসিয়া উন্মত্ততার প্রখরতা মন্দীভূত করিতেছে এবং হৃদয়নির্ব্বাসিত গৃহসুখের কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ভারতের এই সীমান্তরালবর্ত্তী বিজন গিরিপাদমূলে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। কাজেই এখন ঠিক পথেই চলিতে হইবে; এখন শ্রীনগর ভেদ করিয়া তিহরীর অভ্যন্তরপথে মসূরী পৌঁছিতে হইবে;—সেখান হইতে ঐ ত দেরাদুন দেখা যাইতেছে। সে তাহার পাষাণবক্ষপঞ্জরে স্নেহবাহু দ্বারা বাঁধিবার জন্ত অঙ্গুলিসঙ্কেতে ঐ ক্রমাগত আমাকে আহ্বান করিতেছে। দেরাদুন

শ্রীনগর।

আমার উন্মত্ত অধীর হতাশ হৃদয়ের প্রথম অবলম্বন, আমার প্রথম সন্ন্যাসের পবিত্র তপোবন, আমার নিরাশার উর্ম্মিমুখর অকূল সমুদ্রের আলোকস্তম্ভ, আমার ইহকাল ও পরকাল, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান লোপ করিবার সুবর্ণ সেতু। কত দেশে পরিভ্রমণ করিলাম, হিমালয়ের সুমহৎ বিরাট্ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না; পার্ব্বত্যনির্ঝরের নিত্য উৎসারিত রজতদ্রব তুল্য সুনির্ম্মল অমৃতধারা অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াও মর্ম্মভেদিনী পিপসার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হইল না। তাই এখন ভগ্ন মনে, শূন্য হৃদয়ে কম্পিত পদে, ক্লান্ত দেহে উৎকণ্ঠাকুল প্রিয়জন-সন্দর্শনলোলুপ প্রবাসীর ন্যায় আমার অন্তিম অবলম্বন দেরাদূনের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি;—এখন বাঁকা পথ ধরিয়া আর কেন চলিব? তাই আজ সরল পথ ধরিয়া যাত্রা করিয়াছি। জানি, একদিন এ যাত্রার অবসান হইবে; কিন্তু জীবনের শেষ দিন মহাযাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে এই বিয়োগ-বিষাদ-সমাচ্ছন্ন জীবন-নাটকের কয়েকটা শোচনীয় অঙ্ক কি ভাবে অভিনীত হইবে, তাহা কে জানে? দুর্ভেদ্য অন্ধকার-যবনিকায় ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন!

তিহরীর পথে।

শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়াই আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে অলকনন্দার বক্ষে প্রসারিত-লৌহ-সেতু অতিক্রম করিলাম। নির্জ্জীব, ধূসর, বক্রতা-বহুল ভুজঙ্গ-দেহের ন্যায় যে পার্ব্বত্যপথ হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহা অলকনন্দার বাম পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা মন্থরগতিতে নদী পার হইলাম, নদীতীর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অলকনন্দা গিরি-নদী; জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তুষার-বিগলিত জলধারা অলকনন্দার জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছে। গিরিনদী বিস্তৃত-কায়া নহে, কিন্তু খরস্রোতা। তাহার উপলবন্ধুর বক্ষ ভেদ করিয়া তুষার-নির্ম্মল সলিল-রাশি, ফেনময় কলহাস্য-তরঙ্গে প্রাণের সকল বাসনা ভাসাইয়া লইয়া অধীর অট্টনাদে তটভূমি ঝঙ্কারিত করিয়া প্রেমসিন্ধু-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। নদীবক্ষে কোথাও আবর্ত্ত, কোথাও জলরাশি পাষাণ অবরোধ লঙ্ঘন করিয়া প্রপাতের ন্যায় শব্দ করিয়া পড়িতেছে। গতির বিরাম নাই, বাধার প্রতি লক্ষ্য নাই; ভক্তের নিষ্ঠার ন্যায়, সাধুর পবিত্রতার ন্যায়, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের ন্যায় এবং প্রবাসীর গৃহানুরাগের ন্যায় তাহা একান্ত একাগ্রতাপূর্ণ।

সেই পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া কতক্ষণ অলকনন্দার সেই রজতপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহার অস্ফুট মর্ম্মকাহিনী যেন এক অর্থহীন রহস্য-ভাবের ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া আলাময় বক্ষে, অশান্তি ও অকল্যাণের কলঙ্কধ্বজা স্কন্ধে লইয়া

কি উদ্দেশ্যে আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? জীবনের কোনও সাধ, কোনও আশা পূর্ণ হইল না; তথাপি জীবনধারণের এ বিড়ম্বনা কেন? তাহা অপেক্ষা যদি ঐ প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণীর ন্যায় জীবনের উভয় কূল প্লাবিত করিয়া চিরপ্রেমের অনন্ত পারাবারে, কৃপাসিন্ধুর বিশালতায় আপনার এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিতাম! কিন্তু হায়, সে সাধ্য আমার নাই; সাহস নিতান্ত সামান্য, বিশ্বাস নিতান্ত অল্প, অনন্ত নির্ভরের প্রতি নির্ভর করিবার শক্তির একান্ত অভাব। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি সেই তীরপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রবাহিণী আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া আত্মসম্মানভরে স্পর্দ্ধান্বিতা; আলোকে, পুলকে, গৌরবে ও তরলতায় ঝঙ্কারময়ী; বিপুল-সৌন্দর্য্য গর্ব্বিতা বিশ্ববিমোহিনীর ন্যায় তাহার শুভ্র তরঙ্গের অঞ্চল হেলাইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে তাহার গতিপথে ছুটিয়া চলিল।

পূর্ব্বে অনেকের কাছেই শুনিয়াছিলাম, 'এ সড়ক বহুৎ উমদা' অর্থাৎ চড়াই উৎরাইএর একান্ত অভাব। প্রকৃত পক্ষে অলকনন্দা পার হইয়া এক মাইলের মধ্যে পথের দুর্গমতা দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু এক মাইল পরে আমাদিগকে অলকনন্দার তীরভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল; কারণ, সে পথ দেবপ্রয়াগে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং গতি পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক আমাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া তিহরীর পথ ধরিতে হইল। সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া একবার নূতন পথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, উহা অসমতল, দুরারোহ, দুর্গম ঊর্দ্ধ ভূমি দিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতে আমি ভীত হইলাম না। কারণ, এ বিদ্যায় আমি অনভ্যস্ত নহি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াই ত আমি আমার জীবনের অনন্ত অবলম্বন হিমাচলের বক্ষে, তাহার দুর্গম উপত্যকায়, তাহার বিপৎসঙ্কুল পথহীন অধিত্যকায় উন্নতের

ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ইহাই যদি আমার এক-মাত্র সাধনা হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ভগবান্ আমার সে সাধনা সিদ্ধ করিয়াছেন। আমি রত্নের সন্ধানে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে বৃথা পরিভ্রমণ করিয়াছি। সমস্ত দিন পার্ব্বত্যপথের সহিত সংগ্রাম করিয়া দিবাবসানে যখন শ্রমখিন্ন অবসন্ন চরণদ্বয় আর উঠিতে চাহিত না, যখন সমস্ত দিনের নিদারুণ রৌদ্রসন্তপ্ত, বিদীর্ণপ্রায় ব্রহ্মরন্ধ্র লইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতাম, সন্ন্যাসিজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন লোটা কম্বল ও উদ্দেশ্যহীন গুরু জীবনভার যখন অসহ্য বোধ হইত, তখন অভি-মানী সন্তান স্নেহময়ী মাতার উপর রাগ করিয়াও যেমন তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে,—আমিও সেইরূপ পর্ব্বতের উপর রাগ করিয়া ক্লান্ত দেহে উপলশয্যা অবলম্বন করিতাম। ধীরে ধীরে অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইত, চরাচরব্যাপী অন্ধকারের ক্রোড়ে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গসমূহ লুপ্ত হইয়া যাইত, ঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তীর্ণ কোটিনক্ষত্রখচিত নীলাকাশ—যেন স্তব্ধতার দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র, চতুর্দ্দিকে শিখরে শিখরে নানাজাতীয় ওষধি—মাধবের নীলবক্ষে কৌস্তভের ন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিত; সে কি এক রঙ্গ! তাহার উপর বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ড হইতে লাল, নীল, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিচিত্র প্রভা ফুটিয়া উঠিত। শুইয়া শুইয়া মনে হইত, যেন বিশ্বের অনাদি দেবতা তাঁহার অনন্ত রূপকে শান্ত করিয়া তাঁহার অস্তিত্বের অসীমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া এই সীমাহীন নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে যোগময় মহেশ্বরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া পর্ব্বতবিহারী ভক্তগণের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন। নানা বর্ণের পুষ্প দ্যুতিমান্ হীরক-খণ্ডের ন্যায় হারের আকারে তাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত, অর্ঘ্যের ন্যায় চরণো-পান্তে প্রসারিত। দেখিতে দেখিতে গিরি-অন্তরাল হইতে শশধরের রজতকৌমুদী-সংস্পর্শে অন্ধকারের স্বপ্নকুহেলিকা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত

হইত। চন্দ্র আরও উর্দ্ধে উঠিত, তাহার বহু নিম্নে তুষারকিরীটশুভ্র গিরিশিখর চন্দ্রালোক-চুম্বিত নিস্তরঙ্গ বারিধিবক্ষের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিত। আমি নিদ্রালস নেত্রে উৰ্দ্ধগগনে চাহিয়া দেখিতাম, সেই খণ্ডচন্দ্র শুভ্রদেহ ব্যোমকেশের তৃতীয় নেত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, তাহা হইতে শান্তি ও প্রসন্নতা ক্ষরিত হইয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত ধরণীর বক্ষে অমৃত সেচন করিতেছে—সেই অমৃতধারা ধীরে ধীরে আমার শ্রান্ত ললাটে, আমার উত্তপ্ত মস্তকে বৃষ্ট হইত—আমি অজ্ঞাতসারে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতাম; বিশ্বজননী আমার শিয়রে বসিয়া কিরূপে দেহের জড়তা, মনের অবসাদ, প্রাণের হাহাকার দূর করিতেন তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রভাতে যখন সুখস্পর্শ সমীরণের মৃদু কম্পনে, অদূরবর্ত্তিনী বৃক্ষরাজির শরশর শব্দে, বনবিহঙ্গের সুমধুর বৈতালিক সঙ্গীতে আমি নয়ন উন্মীলন করিতাম, তখন দেখিতাম, নবজীবন লাভ করিয়াছি—ইহাই আমার দুর্গম গিরিপথের বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাস,—আমার তুচ্ছ জীবনস্বপ্নের চরম সার্থকতা।

নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, সম্মুখে আড়াই মাইল দীর্ঘ একটি চড়াই। এই চড়াই অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে সাড়ে তিন মাইল অবতরণ করিলে, তবে এক বেলার জন্য বিশ্রাম লাভের অবসর হইবে। মধ্যাহ্নকালে আশ্রয়স্থান ও আহার লাভের আশা ফলবতী করিতে হইলে, এই ছয় মাইল চড়াই ও উৎরাই পার হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, পথিমধ্যে অন্য কোন স্থানে চটি বা পান্থ-নিবাস থাকা দূরের কথা, এই ভয়ানক গ্রীষ্মের সুতীক্ষ্ণ সৌরকর হইতে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য একটি শাখা-পত্র-ভূষিত ছায়া-শীতল তরুতল পর্য্যন্ত কোন স্থানে বর্ত্তমান নাই। ছয় মাইল দূরে যে আশ্রয়স্থান, তাহাও আবার সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। সেখানে তিহরীর রাজার একখানি

বাংলা আছে ;—এই বাংলা অতিথিশালা নহে—ডাক বাংলা—সাহেবেরা যাহাকে Dawk Bungalow বলেন, তাহাই। ইহা রাজকর্ম্মচারিগণের বিরামগৃহ, গৃহীর কর্ম্মক্ষেত্র। সাধু-সন্ন্যাসিগণকে তাহার শত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়স্তিমিত দৃষ্টিতে রাজকর্ম্মচারীদিগের অখণ্ড প্রতাপের পরিচয় লাভ করিতে হয়। মস্তকের উপর দীপ্ত সূর্য্যকিরণ অধিক সুতপ্ত, কি ধরাতলের এই সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দণ্ডের উত্তাপ অধিক অসহনীয়—তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। সেখানে যে আমাদের ন্যায় সন্ন্যাসীর মস্তক রক্ষা করিবার স্থান পাওয়া যাইবে, সে আশা আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু শুনিয়াছিলাম, ডাক বাংলার অদূরে একখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে। তাহাকেই আমরা ডাক বাংলাতে পরিণত করিব, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া দুস্তর চড়াই অতিক্রমের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কি সঙ্কটাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ! সূর্য্যদেব এখনও পূর্ব্বাকাশে, পূর্ব্বাহ্ণের অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ; কিন্তু তথাপি সেই দুঃসহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করা কি কঠিন! পদতলে গিরিপৃষ্ঠ সূর্য্যোত্তাপে আলোকহীন উত্তাপসার বহ্নির ন্যায় জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে; বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ক্ষুদ্র তৃণগাছটি পর্য্যন্ত নাই,—কেবল বক্রপথ, ক্রমাগত চড়াই; পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, নিশ্বাস রোধ হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া দরবিগলিত ধারায় ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সমান সহিষ্ণুতার সহিত সেই প্রস্তরীভূত অগ্নিরাশির উপর দিয়া চলিতেছি; নিম্নে অগ্নিরাশি, ঊর্দ্ধে বহ্নিচক্র। এক বার হৃদয়ের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, সেখানেও অগ্নির অভাব নাই, সেখানকার অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ; সেই অগ্নিস্রোত বক্ষে ধরিয়া জুড়াইবার আশাতেই এই সুদুস্তর বহ্নিচক্রে ঝাঁপ দিয়াছি। সুতরাং নিজের অবস্থার কথা চিন্তা

করিয়া সেই অতি দুঃসময়েও মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হইল। মনে হইল, আজ এই পথকষ্টে এত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছি কেন, এত অশান্তি বোধ করিতেছি কেন? জীবনে শান্তি কবে পাইয়াছি? জ্ঞানসঞ্চারের পূর্ব্বেই শৈশবের অদ্বিতীয় অবলম্বন-দণ্ড-জ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ভক্তির প্রথম সোপান পিতৃদেবকে হারাইয়াছি; মায়ের অভাবের কথা আর বলিব না। – তাহার পর, যৌবন-মধ্যাহ্নে যখন চির-প্রেমময়ী, প্রসন্নতাস্বরূপিণী, অসীম-ধৈর্য্যশালিনী, মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধার ন্যায় মহীয়সী প্রণয়প্রতিমা পত্নীর প্রগাঢ়-প্রেমসরোবরকূলে উপবেশন করিয়া ব্যাধতাড়িত, কম্পিতপক্ষ, ঘর্ম্মাপ্লুতবক্ষ, পিপাসী কপোতের ন্যায় আকণ্ঠ জলপানে পিপাসা পরিতৃপ্তির বাসনা করিতেছি,—এমন সময়ে সহসা—কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে সেই সরোবর মুহূর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইল—আমি সেই দিন হইতে সেই মরুভূমির উপর দিয়া মহাবেগে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছি—দিবা নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্রমাগত চলিতেছি। এখন আবার কিসের ভয়, কিসের কষ্ট? আশাহীনের কোন কষ্ট নাই। হৃদয়ের যে অনলদাহ, বাহিরের উত্তাপে তাহার জ্বালা বাড়িবে না।

আমি ললাটের ঘর্ম্ম অপসারণ করিয়া, বিধাতার চিরমঙ্গলময় উদ্দেশ্যের প্রতি আমার সন্দেহান্দোলিত দুর্ব্বল হৃদয়ের সকল আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করিয়া পর্ব্বতভ্রমণোপযোগী সুদীর্ঘ যষ্টির সহায়তায় কম্পমান পদে, অবসাদবিকল দেহে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। মনুষ্য যদি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের সময়ে, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিনে ভগবানের করুণায় নির্ভর করিতে না পারিত, তাহা হইলে তাহার সকল সান্ত্বনার পথ যুগপৎ রুদ্ধ হইয়া যাইত, তাহার জীবনধারণ করা অত্যন্ত সুকঠিন হইত। আজ এই বিপৎকালে যখন

দেহ শ্রান্ত ও ক্লান্ত, পদদ্বয় অবসন্ন ও কম্পান্বিত, চলৎশক্তি রহিতপ্রায়, তখন ত ভগবানের করুণায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। রৌদ্রতপ্ত ধূসর মরুময় পর্ব্বতবক্ষের অনেক উর্দ্ধ-চড়াইয়ে শ্যামল মেঘের ন্যায় যে দৃশ্য সন্দর্শন করিতেছিলাম, ক্রমে তাহা শালবনে পরিণত হইল। দেখিলাম, প্রকাণ্ডকায় শালবৃক্ষগুলি পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব পাদভূমি ছায়াসমাচ্ছন্ন করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের পত্ররাশি শরশর কম্পিত হইতেছে, নিবিড় পত্রান্তরালে বসিয়া বিহগদম্পতী মধুর স্বরে কূজন করিতেছে—মরুবক্ষোবিহারী পথশ্রান্ত তৃষাতুর পথিকের নয়ন-সমক্ষে যেন, ঢল ঢল বিমল সলিলপূর্ণ সরিচ্ছবি আমার নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইল। মৃতের নিরানন্দময়, নিদারুণ শ্মশানভূমি হইতে আমি যেন অমৃতের নবজীবন-হিল্লোলিত শান্তিময় স্বর্গে উপস্থিত হইলাম। সেই পার্ব্বত্য শালতরুনিচয়ের নিবিড় ছায়া আমার দগ্ধ মস্তকের উপর জগজ্জননীর মধুময়-করুণাপরিপূরিত অঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত হইল, কলকণ্ঠ বনবিহঙ্গের সেই মৃদু কাকলী যেন বহু-দিনের বিস্মৃত বান্ধবের প্রীতিভরা মর্ম্মকাহিনী বহন করিয়া আনিতে লাগিল। 'পথশ্রান্ত সন্তান বহুদূর পথভ্রমণ করিয়া ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে অব-সন্ন চরণে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ের কাছে আসিয়া পড়িলে, মা যেমন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অঞ্চল আন্দোলন করিয়া সন্তানের শ্রান্ত-দেহ শীতল করেন, সেইরূপ আমার বোধ হইল, প্রকৃতি-জননী এই সুখ-হীন শান্তিহীন গৃহহীন অনাথ সন্তানের অসহনীয় ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই শালবৃন্ত-হস্তে আমার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন। আমার নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইল, বিশ্বেশ্বরের অপার করুণার প্রতি সুগভীর বিশ্বাসে আমার ক্ষুদ্রতা-ভরা মূঢ়তাপূর্ণ সন্দিগ্ধ হৃদয় ভরিয়া উঠিল, মাতৃমহিমার মাতৃহীনের নিরাশ্রয় রুক্ষচিত্ত বর্ষার প্লাবনে ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায়

কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইল। চড়াইএর সর্ব্বোচ্চ স্থানে আমি একটি শাল-বৃক্ষমূলে আমার অবসন্ন দেহভার স্থাপন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। বিহঙ্গের সেই কলগীতি, সমীরণের সেই অব্যাহতগতি, শালপত্রের সেই শরশর কম্পন ও আমার কল্পনামুখর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস—কবির সুমধুর সঙ্গীতের ভাষায় যেন বিশ্বজননীর মহিমময়ী প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আমি অনুভব করিলাম—

"স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে!

* * *

করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মম অসীম যন্ত্রণা;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখি-জল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি-সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে!"

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পরে সত্যই আমার সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিল, আমার পথশ্রম অপনীত হইল। বেলা ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিলাম। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চড়াইএ উঠিয়াছিলাম, এবার নামিতে হইবে। সম্মুখে "খাড়া উৎরাই" আমি দ্রুতপদে নামিতে লাগিলাম। পর্ব্বতারোহণ যেমন কঠিন, অবরোহণ তেমন কঠিন নহে; সাড়ে তিন মাইল নামিতে অধিক সময় লাগিল না। বেলা দশটা বাজিয়া গেলে, আমি পূর্ব্বকথিত রাজার বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

করোগেটেড্ আয়রণের ছাদ-বিশিষ্ট একখানি ক্ষুদ্র বাংলা। বাহিরের দিকে একটি অনতিদীর্ঘ বারান্দা আছে, সেই বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ, নিম্নদেশে তালা লাগান, কোন দিকে জন-মানবের সম্পর্ক নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একবার তালা নাড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু তালা খুলিল না। তখন উঠিয়া অগত্যা অদূরবর্ত্তী দোকানে চলিলাম। দেখিলাম, সে দোকানখানিও বন্ধ, তাহাতেও তালা লাগান রহিয়াছে। বাংলার চৌকীদারের কোন সন্ধান নাই, দোকানের দোকানীও নিরুদ্দেশ! তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, এমন লোকও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, এই নিদারুণ পরিশ্রমের পর ভগবান্ এবেলা আমাদের অদৃষ্টে একাদশীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় কিছুমাত্র নূতনত্ব ছিল না। কারণ, পর্ব্বতভ্রমণ আরম্ভ করিয়া একাদশীতে আমরা নিত্য অভ্যস্ত। এ ত আর সখের পথভ্রমণ নহে, আবশ্যকতা-সুরোধে 'রিফ্রেশমেণ্ট রুমের' বন্দোবস্তও কোথাও নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া কখন কখন দুই দিনও নিরম্বু একাদশী করা গিয়াছে, পূর্ণিমা প্রতিপদ্ তাহাতে বাধাদান করিতে পারে নাই। তাই সম্মুখে আহারাভাবের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রাণে কিছুমাত্র আতঙ্কের সঞ্চার হইল না; বেশ নিশ্চিন্তচিত্তে বসিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, আজ যদি আমার সঙ্গে বদরিকাশ্রম ভ্রমণের সঙ্গী পরম বৈদান্তিক শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ স্বামী থাকিতেন, তাহা হইলে এই জনহীন গিরিপ্রান্তবর্ত্তী পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমতী ক্ষুধার আক্রোশের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার বিরক্তিপূর্ণ বদনব্যাদান, তাঁহার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভ্রূকুটীভঙ্গী এই অবিচল স্তব্ধ পান্থশালাকেও বিচলিত করিয়া তুলিত। শ্রীমান্

সংসার ত্যাগ করিয়াছেন কেন, কোন দিন তাহা আমার ন্যায় সুহৃদ্বরের নিকটও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যত দিন তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসের একমাত্র অবলম্বন লোটা কম্বল, তাঁহার উৎকট পাণ্ডিত্যের একমাত্র পরিচয় কঠোর বেদান্ত-দর্শনের কূট যুক্তি, তাঁহার ক্ষুধার দাহিকা শক্তি কোন দিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু অচ্যুত স্বামী আর আমাদের সঙ্গে নাই। কক্ষচ্যুত ভ্রাম্যমাণ ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আমরা একত্র হইয়াছিলাম, সুখে দুঃখে কত দিন অবোধ শিশুর যুক্তিহীন আবদারের ন্যায় তাঁহার স্নেহের আবদার সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার আদর, তাঁহার অভিমান, তাঁহার ক্রোধ এবং অনুনয় বিনয়ের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি ঠিক পার্ব্বত্য প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা এক দিন পথপ্রান্ত হইতে তিনি সেই উচ্ছ্বসিত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তপক্ষ বনবিহঙ্গের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন, কে জানে? তাঁহার কথা এখনও, এই অকিঞ্চিৎকর জীবন-নাটকের একাংশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

তিহরীরাজের ডাক বাংলার বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর শ্রান্ত দেহ বিস্তীর্ণ করিয়া নিমীলিত নেত্রে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম; কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম, বলিতে পারি না। সহসা চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে লইয়া একটা লোক সেই বাংলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে একটা মানুষ দেখিয়া প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার হইল। লোকটা হয় ত ভাবিয়াছিল, কোন সাধু এখানে শুইয়া শুইয়া ভগবানের চরণ ধ্যান করিতেছে;—আমি যে সংসার ছাড়িয়া তখনও সংসারের মায়ামোহ ও, ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা চিন্তা করিতে-

ছিলাম, তাহা সেই মানবচরিত্রানভিজ্ঞ পর্ব্বতবাসী সরল মূর্খ কি করিয়া বুঝিবে? সে আমাকে প্রসারিতনেত্রে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিল। গেরুয়া বসনের মাহাত্ম্য! আমি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বসিবার জন্য অনুমতি করিলাম। সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে দূরে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জ্ঞাত করিল যে, এই বাংলারক্ষক চৌকিদার মহাশয় কোন বিশেষ রাজ-কার্য্য-ব্যপদেশে তিহরী গিয়াছেন, আজ প্রত্যাগমনের কোন সম্ভাবনা নাই। দোকানদার মহাশয়ও দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়াছেন, তাঁহার ঘর কিছু দূরে। এ পথে সর্ব্বদা লোকজনের গতিবিধি না থাকায় দোকানখানি অনেক সময়েই বন্ধ থাকে। হাতে বিশেষ কাজকর্ম্ম না থাকিলে আর তিনি তাঁহার পণ্যশালায় শুভাগমন করেন না। আগন্তুক লোকটি এই স্থান হইতে তিন মাইল নিম্নবর্ত্তী কোন গ্রামের জমীদারের পাইক। জমীদার মহাশয়ের সহিত সে দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামে গিয়াছিল, কার্য্য-শেষে ফিরিয়া আসিতেছে। শুনিলাম, জমীদারও পশ্চাতে আসিতেছেন। পাইক আশ্বাস দিল, জমীদার মহোদয়ের আগমন হইলে সাধুসেবার আয়োজন হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার কথা শুনিয়া সাধুর মনে যে নিরতিশয় আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা পাইক-বেচারা বুঝিতে পারিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাধুজী অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত জমীদারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাইকের মুখে শুনিলাম, এখান হইতে ছয় মাইল দূরে রাজার আর একখানি বাংলা আছে, কিন্তু সেখানে দোকানপাট কিছু নাই, সেখান হইতে যদি আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়, তবে একখানি দোকানে ঘি আটা মিলিতে পারে। নিদাঘ-মধ্যাহ্নের এই ভয়ানক রৌদ্রে পরিশ্রান্ত দেহে পাহাড়ের উপর দিয়া এই

দ্বাদশ মাইল পথ ভ্রমণের উৎসাহ, আগ্রহ বা সামর্থ্য আমার ছিল না। বিশেষতঃ সেই দোকানদারও যদি এই দোকানীর মত দোকান বন্ধ করিয়া 'ঘর' গিয়া থাকে, তবে ক্ষোভ ও বিরক্তি ভিন্ন অন্য কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জমীদার মহাশয়ের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকাই সঙ্গত জ্ঞান হইল।

অবশেষে জমীদার মহাশয় সেই বাংলায় আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও দুজন লোক। এতগুলি লোক নিশ্চয়ই একত্র একাদশী করিবে না ভাবিয়া আমি কিছু প্রসন্ন হইলাম। জমীদার মহাশয় সাধুর অভিবাদন করিলেন। বলিলেন, বহুপুণ্যফলে এমন নির্জ্জন স্থানে তাঁহার সাধুসন্দর্শন হইল। পুণ্যফল কাহার অধিক, সে কথা চিন্তা করিয়া আমি সহাস্যমুখে জমীদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিলাম।

জমীদার মহাশয় ও তাঁহার অনুচরগণকে ডাক বাংলায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। জনমানবশূন্য নির্জ্জনস্থানে মনুষ্য-সমাগম যে কি প্রীতিকর, তাহা অনুভব করিলাম। বলা বাহুল্য, এই দিবা দ্বিপ্রহরে, কোন ঐন্দ্রজালিক-মন্ত্রবলে, কিংবা আরব্যোপন্যাসসুলভ আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ ঘর্ষণ করিয়া, এই মরুতুল্য অচলপৃষ্ঠে তিনি খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিবেন, এরূপ দুরাশায় আমরা আশ্বস্ত হই নাই। আমার মনে হইল, আমি এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অপরিচিত পথ ভ্রমণে নানা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা; এ অবস্থায় তাঁহার ন্যায় একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিব, ইহা অল্প সুবিধার কথা নহে। আহারাভাব হইলেও বড় দুশ্চিন্তা ছিল না; এ জীবনে ত কতদিন একাদশী করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছি, ক্ষুধায় কাতর হইয়া গিরিবক্ষনিঃসৃত নির্ঝরের

স্ফটিক-বিমল জলধারা আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিয়াছি ; কখন তাহাও পাই নাই ; কিন্তু কোন দিন ত পড়িয়া থাকে নাই ! আজিকার এ দীর্ঘদিনও না হয়, সেইভাবে অতিবাহিত হইবে। উপবাসই এ পথের প্রধান সম্বল, তবে দৈবাৎ কিছু আহার্য্য মিলিলে তাহা নিতান্তই ভগবদনুগ্রহ মনে হইত। সুতরাং আহারের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্মিতমুখে জমীদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করা গেল।

ডাক বাংলায় সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখিয়া জমীদার মহাশয় মহা-সম্ভ্রমে আমাদের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিলেন। অন্য কাহারও মনে যাহাই হউক, ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম ;—আমি এখনও ভাল-রকম 'সাধু' হইতে পারি নাই, গঞ্জিকার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, ভস্মে দেহ ভূষিত করিতে শিখি নাই ; সাধু সন্ন্যাসীর মত নির্লজ্জভাবে, যাহা জানি না, তাহা লইয়া অজস্র বাক্য-স্রোত উদ্গীরণ করিতেও এ পর্য্যন্ত অভ্যস্ত হই নাই ; তথাপি জমীদার মহাশয় আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন, ইহাতে নিজের ক্ষুদ্রতার কথা ভাবিয়া বড় অস্বচ্ছ-ন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার মনে সহসা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল। মনে হইল, আমার এ সন্ন্যাস-বিড়ম্বনার মধ্যেও কোন সুখ, কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি নাই ; যাহাতে আমার অধিকার নাই, অম্লান-বদনে তাহা আত্মসাৎ করিয়া কেন পাতকগ্রস্ত হইতেছি ? কেন অন্যকে প্রতারিত করিতেছি ? কিন্তু অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই ; আমার হৃদয়ে যতই অসাধুভাব থা'ক, আমার চিত্তে যতই দুর্ব্বলতা থা'ক, আমার জ্ঞাননেত্র যতই অন্ধ হোক, সাধুর অভিনয় আমাকে করিতেই হইবে ; নতুবা এই পর্ব্বতপ্রান্তে কোন্ গিরিগুহায়, কোন্ তৃণাচ্ছন্ন অদৃশ্য রসাতলগর্ভে আমার মত নিরাশ্রয় শ্রদ্ধাবিশ্বাসশূন্য লোকের দেহ নিপতিত হইবে, কে বলিতে পারে ? ভণ্ডামিটাও আমাদের

আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে এতই আবশ্যক হইয়া উঠে! এ দোষ কাহার, তাহা বলিতে পারি না;—সাধু সন্ন্যাসীর, না লোটা, কম্বল, গেরুয়া বসনের? যাহারই হোক, কিন্তু আমার সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ সাধু-সন্ন্যাসিগণের দ্বারাই শাসিত। যাঁহারা সংসারের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, কামিনী-কাঞ্চনের মোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনাদি অনন্ত বিশ্বদেবতার চরণে সুপবিত্র জীবন-কুসুমাঞ্জলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মঙ্গলকিরণানুরঞ্জিত নৈতিক প্রভাবে যে দেশ শাসিত হয়, যে দেশের সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সে দেশ চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরূঢ় থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের এ শোচনীয় অধঃপতন কেন? আমাদের ন্যায় এবং আমাদের অপেক্ষাও নরাধম সন্ন্যাসিদলের আতিশয্যই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইল। ভণ্ডামি সর্ব্বত্র; এমন কি, 'সন্ন্যাসগিরি'ও এখন একটা ব্যবসায়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যবসায়ে পরিশ্রম অল্প, দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট নাই, অথচ লাভের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই ব্যবসায়ের দিকে বহুলোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে মঠধারী মোহান্ত হইতে ভেকধারী ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই শুকদেব গোস্বামীর অভিনব সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহারা আর কিছু না জানুক, এটুকু জানে যে, এই গৈরিকবসন ভারতজয়ি। ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে ইহা সবল ও দুর্ব্বল সর্ব্বশ্রেণীর ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারে। হয় ত আমাদের দেশের জনকতক শিক্ষিত যুবক প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া ইহার প্রতি বীতরাগ; কিন্তু এ ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে তাঁহারা কয় জন? কয়জন তাঁহাদের মতের সারবত্তা স্বীকার করে? ত্রিশকোটির

মধ্যে তাঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি, তাঁহাদের যুক্তি, বিশ্বাস—সমস্ত ডুবিয়া যায়।

প্রলোভন ত অল্প নহে! এই রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডের মহিমায় কত নরপিশাচ বিনা পরিশ্রমে উদর পূরিয়া আহার করিয়া থলি ভরিয়া অর্থ লাভ করিতেছে; দেশ ছাড়িয়া নাম বাহির করিতেছে। হিন্দুর গৃহদ্বার সাধু-সন্ন্যাসীর জন্য উন্মুক্ত দেখিয়া দলে দলে লোক যে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু শিক্ষিত লোক যতই নাসিকা কুঞ্চিত করুন, অশিক্ষিত জনসমাজে, অন্তঃপুরে এখনও গৈরিক বসন ও জটা-ভস্মের অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; এখনও তাহারা হিমাচলের পাষাণবক্ষ হইতে কন্যাকুমারিকার সুনীল-সিন্ধু-বিধৌত শ্যামল তটভূমি পর্য্যন্ত অটুট অধিকার বিস্তৃত রাখিয়াছে। সরলতার প্রতিমা, শ্রদ্ধাভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভারতলক্ষ্মীগণ সাধু দেখিলেই, সে যতই পাপিষ্ঠ হউক, ভক্তিভরে মস্তক অবনত করেন; তাহার পর যদি সেই সাধু নানা 'তীরথ' দর্শন করিয়া থাকেন, কিংবা দর্শন না করিয়াও অসঙ্কোচে মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বতীর্থ সন্দর্শনের অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, দুই চারিটা অশুদ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে গৃহলক্ষ্মীগণ ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাদের জন্য সে শুধু আটা ঘৃতের বন্দোবস্ত করেন তাহাই নহে, অম্লান বদনে তাঁহারা তাঁহাদের সযত্ন-সঞ্চিত স্বর্ণ ও রজতখণ্ডও সাধুচরণে উপহার দান করিয়া আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। হিমালয়ের নিভৃতবক্ষেও এমন ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর অভাব নাই; ইহা তাঁহাদের জাতীয় প্রকৃতি। আমার পরিধানে যদিও গৈরিক বসন, অঙ্গে ভস্ম ও মস্তকে জটাভার ছিল না, তথাপি আমার মলিন ছিন্ন বস্ত্র, আজানুবিলম্বিত কম্বল, পর্ব্বতভ্রমণের সুদীর্ঘ যষ্টি এবং ধূলিময় বিশৃঙ্খল কেশরাশি আমার সাধুত্ব বিঘোষিত করিতেছিল। তাহার

উপর সাধুর ভণ্ডামিও যে একেবারেই না ছিল এমন নহে ; দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নিজের সন্ন্যাস-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দুই চারিটি সাধুবাক্যও প্রয়োগ করিতে হইত ; কিন্তু তাহার একটি উপদেশও প্রতিপালন করা কি কঠিন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় কোন দিন হয় নাই। বাহিরের কম্বল ও ভিতরের আত্মম্ভরিতা ইহাই আমাদের সন্ন্যাসের প্রধান সম্বল। আমরা সাধু!

যাহা হউক, লোকের ভিতরের দিক্‌টা সহসা অন্যের দৃষ্টিপথে পড়ে না, আর বাহ্য খোলস দেখিয়াই মনুষ্যের মর্য্যাদার বিচার হয়, তাই জমীদার মহাশয় আমাকে একটি মহাতেজস্কর সাক্ষাৎ বিশ্বামিত্রতুল্য পরাক্রান্ত তপস্বী স্থির করিয়া আমার অদূরে ধরাসনে সসম্ভ্রমে উপবেশন করিলেন। তাঁহার অনুচর পদাতিকদ্বয় কিছু দূরে বসিয়া শ্রম দূর করিতে লাগিল। আমরা তিহরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি শুনিয়া, জমীদার মহাশয় আত্ম-পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই পরিচয় হইতে জানিতে পারিলাম, তিনি তিহরীর রাজার একজন অতি নিকট কুটুম্ব। এই কুটুম্বতাসূত্রে তিনি তিহরীর রাজপরিবার হইতে একখণ্ড ক্ষুদ্র জমীদারী লাভ করিয়াছেন ; এই জমীদারির আয় হইতেই তাঁহার সংসার প্রতিপালন ও সাধুসেবার কার্য্য নির্ব্বিরোধে সম্পন্ন হয়। এ কথাটা শুনিয়া আমাদের সেই শিক্ষা-সভ্যতা-সমাচ্ছন্না নদীমেখলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি স্বধর্ম্ম-নিরত রাজপ্রসাদ-লোলুপ জমীদার-পুঙ্গবগণের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের মধ্যে কয়জন সাধুসেবাকে তাঁহাদের পারিবারিক কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত করেন? সেরূপ জমীদার বাঙ্গালাদেশে শতকরা একজনও আছেন কি না সন্দেহ। এমন একদিন ছিল, যেদিন তাঁহাদিগের পুণ্যপ্রয়াসী পিতৃ-পুরুষগণ পরোপকারসাধনে প্রচুর অর্থব্যয় জীবনের একটি আবশ্যক কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তাঁহাদের গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত,

সেই সকল পার্ব্বণোপলক্ষে প্রচুর ব্যয়-বিধানের নিয়ম ছিল; দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্রদান, পরের দুঃখ মোচন ও প্রজার নিকট হইতে লব্ধ অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইত। তাঁহাদের অতিথিশালায় বহুদূর-দেশ হইতে সমাগত অতিথিগণ আশ্রয় লাভ করিত; তাঁহাদিগের প্রতি-ষ্ঠিত জলাশয় নিদাঘপীড়িত তৃষ্ণার্ত্ত প্রজাপুঞ্জের জলকষ্ট নিবারণ করিত। পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মীগণ পরসেবাব্রতকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের সে দিন আর নাই, আমাদের দেশের সুখ ও কর্ত্তব্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে এখন বিজ্ঞাপনের যুগ; যাঁহারা হিতকর কার্য্য করেন, তাঁহারা অধিকাংশস্থলেই ঢক্কানিনাদ সহকারে স্ব স্ব মহিমা প্রচার না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না; উপাধির আশায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সৎকার্য্যে অর্থদান করেন, এবং গবর্ণ-মেণ্ট গেজেটে সেই দানের সংবাদ প্রচারিত হইলেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। সৎকার্য্যের জন্য এরূপ দানেও দেশের উপ-কার হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত এইপ্রকার প্রলোভনই তাঁহাদিগের দানশক্তিকে পরিচালিত করিতে থাকে, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দেশের নিরন্ন অনাথগণ আর মুষ্টিভিক্ষা লাভেও সমর্থ হইবেন না, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সমাদর একেবারেই অনা-বশ্যক প্রতীয়মান হইবে। বঙ্গদেশে এমন একদিন ছিল, যখন অতিথি-সৎকার মহাপুণ্যের কার্য্য বলিয়া গৃহস্থগণের বিশ্বাস ছিল; এমনও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, যে দিন গৃহে কোন অতিথির আবির্ভাব না হইত, গৃহস্থ সেদিন নিতান্তই নিরর্থক গেল বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গালা দেশের লোকের হৃদয় হইতে এই প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে; এমন কি, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে গৃহে আশ্রয়দান করা একালে অনেকে মহানির্বোধের কার্য্য মনে করেন। এই সকল কারণে বঙ্গগৃহে আর

তেমন অতিথির সমাগম হয় না; দেশভ্রমণের নানাবিধ সুবিধা হওয়াতে অতিথির সংখ্যারও অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, নিতান্ত বিপদে না পড়িলে এখন আর কেহ কাহারও গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য প্রার্থনা করে না। কিন্তু পথঘাটবর্জ্জিত এই হিমাচল-বক্ষস্থিত অতি দুর্গম পল্লী-সমূহ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, এখানে অনেক প্রবাসী পান্থকেই বাধ্য হইয়া পরগৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইতে হয়। গৃহস্বামিগণও তাহাদিগকে আহার ও আশ্রয় দান একটি প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই রায় বাহাদুর বা রাজা খেতাব লাভের আশায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক এক বাণ্ডিল কোম্পানীর কাগজ দান করেন না, মিউনিসিপালিটীর কমিশন কিংবা জেলা বোর্ডের মেম্বর হইবার আগ্রহ তাঁহাদের নাই, চাঁদার খাতায় তাঁহাদের সহিও দেখা যায় না; কিন্তু স্বয়ং অনাহারে থাকিয়াও গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অতিথিসৎকারে কোন দিন তাঁহাদের বিরাগ নাই। আর ইঁহাদের সামর্থ্যই বা কতটুকু!—আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ যে জমীদারটি—পরিচয়ে বুঝিতে পারিলাম, ইনি বেশ একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার; তাঁহার আকারপ্রকার, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গিতে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই; জমিদারীর আয় হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কারণ, ইঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের জমীদার; আমাদের সমতল ভূমির জমীদারের ন্যায় কমলা দুই হস্তে ধনধান্য বিতরণ করিয়া ইঁহাদের ভাণ্ডার পূ করেন না। হিমালয় অতুল সৌন্দর্য্যের আকর; হিমালয়ের নিভৃত পাষাণবক্ষের ভিতর প্রসন্নসলিলা প্রেম-মন্দাকিনী অবিরল নির্ঝর-ধারায় প্রবাহিতা, হিমালয়ের অপরিজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত অন্ধকার গহ্বরে কত মণি মুক্তা, কত কুবেরের ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য, রাশি রাশি ধনরত্ন সঞ্চিত আছে; কিন্তু হিমাচলের পাষাণবক্ষে শস্যোৎপাদনের কোন সুবিধা নাই,

চাষ করিবার উপযুক্ত জমী প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না; তথাপি উহারই মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অধিবাসিগণ গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য যৎসামান্য উৎপাদন করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে, তদ্দ্বারা অতিথিসৎকারও করিয়া থাকে। প্রজার যেখানে এইরূপ অবস্থা, সেখানে সেই সকল প্রজার ভূস্বামী জমীদারগণের অবস্থা যে কিছুমাত্র সচ্ছল নহে, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং বলা বাহুল্য, আমাদের এই জমীদার মহাশয়ের আয় অতি সামান্য; তবে তাঁহার একটা সুবিধা এই যে, তাঁহাকে রাজকর যোগাইতে হয় না। তাঁহার প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্, এবং তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন; তাঁহার সহিত আলাপে তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমরা এখন যেখানে বসিয়া আছি, তাহাও তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত; এই স্থানটির নাম ডাক-চওড়া। নামের ডাক খুব চওড়া হইলেও স্থানের জাঁক কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না; কিন্তু এজন্য স্থানটির প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করা যায় না। আমাদের বীরশূন্য বঙ্গদেশে আজকাল অনেক বীরেন্দ্রনাথ, অনেক বিদ্যা-শূন্য বিদ্যাবাগীশ এবং দৃষ্টিহীন পদ্মলোচন দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশে ভূসম্পত্তিহীন ধনবান্ কেবল চাঁদার খাতায় স্বাক্ষরমাত্র সম্বল করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাবে সম্মানিত হন, সে দেশে একটি পার্ব্বত্য উপত্যকা যতই সংকীর্ণ হউক, তাহার নাম ডাক চওড়া হইলে সে নামের সার্থকতা সম্বন্ধে কাহারও কটাক্ষপাতের অধিকার নাই।

আমাদের আহারের কি বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য জমীদার মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সাধু সন্ন্যাসী যে আহারাভাবে কষ্ট পাইবে,

ইহা তাঁহার অসহ্য; এ কথা তাঁহার কথার ভাবেই বুঝিতে পারিলাম। আমরা দেখিলাম, আহারের কোন আয়োজন করিয়া উঠিতে পারি নাই,—তাঁহার নিকট এ কথা প্রকাশ করিলে, তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন; অথচ সে ব্যস্ততায় কাহারও কোন লাভ নাই। আগ্রহমাত্র সম্বল করিয়া মানুষ সকল সময়ে অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না,—বিশেষতঃ সম্বলশূন্য অবস্থায় এরূপ জনমানব-বর্জ্জিত পাহাড়ের দুর্গম বক্ষে। তথাপি তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বলিতে হইল, সঙ্গে নিজের দেহ এবং যষ্টি ও কম্বল ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী নাই; এখানে কিছু পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সুতরাং আমরা আহারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুস্থির চিত্তে কালযাপনের জন্য প্রস্তত হইয়াছি; আর ক্ষুধাতৃষ্ণাকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াই ত এ ভীষণ পথে বাহির হইয়াছি; এ অবস্থায় অতিথি-সংকারের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা অনাবশ্যক।

কিন্তু মানুষ এ পৃথিবীতে আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক কাজও করিয়া থাকে,—জমীদার মহাশয় অল্পকালের মধ্যেই তাহার নজীর প্রকাশ করিলেন। আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ হইলে তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ডাক বাঙ্গালোর বারান্দা হইতে নামিয়া গেলেন; কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না, আমরাও অবশ্য তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য জ্ঞান করিলাম। কৌতূহলের সহিত নীরবে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি দোকানের রুদ্ধ দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার তালাটা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তিনি যে পরের ঘরের তালা এ ভাবে পরীক্ষা করিবেন, এ সম্ভাবনা একবারও আমার কল্পনায় উদিত হয় নাই; এ অধিকার তাঁহার কতটুকু আছে, তাহাও জানিতাম না। কিন্তু তিনি জমীদার মনুষ্য—পার্ব্বত্য প্রদেশের অসীম-ক্ষমতা-সম্পন্ন ভূস্বামী—প্রজাপুঞ্জের জন্ত পরম

উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব—তিনি ইচ্ছা করিলে একটা দোকানের উপর তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। আমার নিকট এই দৃশ্য যতই বিস্ময়-উৎপাদক হউক, তাঁহার পাইকগণ এ ব্যাপার দেখিয়া বিন্দুমাত্রও বিস্ময় প্রকাশ করিল না। জমীদার মহাশয় বার কত তালাটা টানাটানি করিয়া একটু দাঁড়াইয়া একবার কি চিন্তা করিলেন; বোধ হয়, কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে তাঁহার সম্মুখে সাধু সন্ন্যাসী সারা বেলা অভুক্ত থাকিবেন, আর তিনি গৃহে ফিরিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে ও প্রসন্নমনে ডাল রুটির সদ্ব্যবহার করিবেন, আমাদের বঙ্গদেশের লক্ষপতিগণের চক্ষে ইহা বিসদৃশ না ঠেকিলেও, হিমালয়-বক্ষ-বিহারী সেই সরলহৃদয় সাধুভক্ত অশিক্ষিত জমীদারের নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ মনে হইতেছিল। কিন্তু পরের ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া তাহার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না; তাই তিনি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কতক্ষণ চিন্তা করিলেন। অবশেষে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রকাশ করিলেন, যদি আমরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করি, তাহা হইলে তাঁহার গৃহ পবিত্র ও তাঁহার জীবন ধন্য হয়। জমীদার মহাশয়ের গৃহ পবিত্র ও জীবন ধন্য করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, বিশেষতঃ ক্ষুধার আতিশয্য অনুসারে তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে হইয়াছিল; কিন্তু তখন মাথার উপর মধ্যাহ্নসূর্য্য সুতীব্র কিরণজাল বর্ষণ করিতেছিলেন, প্রস্তরখণ্ড অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেহেও ক্লান্তির অভাব ছিল না; সুতরাং অগত্যা ক্ষুধানাশের সুখ অপেক্ষা বিশ্রামের শান্তিই তখন প্রার্থনীয় বোধ হইতেছিল; অতএব সেই মধ্যাহ্নকালে এত কষ্ট সহ্য করিয়া তিন মাইল পথ আহারের প্রলোভনে নামিয়া যাওয়া কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয়

জ্ঞান হইল না। জমীদার মহাশয় শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বোধ হয়, কোন সাধু সন্ন্যাসীর মুখে তিনি আহারের প্রতি এতখানি ঔদাসীন্যের কথা আর কখনও শ্রবণ করেন নাই; তাই পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, সামান্য পথশ্রমের জন্য মহাপ্রাণীকে এতটা কষ্ট দেওয়া কখন সঙ্গত নয়; তাঁহার গ্রামের পথ যেরূপ সিধা, তাহাতে আমরা অতি সহজেই অল্পকালের মধ্যে লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু আমি সর্ব্বত্যাগী সংযম-পরায়ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিলাম; বলিতে কি, শ্রীচরণদ্বয় তখন এই গুরু দেহভার বহনে অসম্মত হইয়া বসিয়াছিল। আর পথের সুগমতা সম্বন্ধে তিনি যতই ভরসা প্রদান করুন, এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না; এদেশের এক ক্রোশের পথও জানি; সোজা পথ কেমন সরল হইয়া থাকে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই; তাই সবিনয়ে জানাইলাম যে, এমন ছায়া-শীতল নিশ্চিত আশ্রয়স্থান ও অনিশ্চিত অনাহার পরিত্যাগ করিয়া আমি অনিশ্চিত আশ্রয় ও নিশ্চিত আহারের সন্ধানে ছুটিতে পারি না। বেশ নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম ভোগ করা যাইতেছে।

জমীদার মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন, এমন আহারসুখ-বিমুখ সাধু দেখিয়া তাঁহার ভক্তি-নদীতে প্রবল জোয়ার বহিল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া গোবধপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বিনামা প্রদানের যৌক্তিকতা হৃদয়-ঙ্গম করিয়া, তাঁহার অনুচর পদাতিকদ্বয়কে সেই দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাহারা অবিলম্বে বিনা সঙ্কোচে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। দুই মিনিটের মধ্যে দোকানের দ্বার উন্মুক্ত হইল, জমীদার মহাশয় তাঁহার অনুচরদ্বয়ের সহিত দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা কৌতূহল-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহাদের অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলাম। জমীদার মহাশয়ের আদেশক্রমে পদাতিকদ্বয় সেই

দোকানী-শূন্য দোকান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আটা, ঘৃত, লবণ ও লঙ্কা বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে সংস্থাপন করিল। আমার পাপ যে একেবারেই হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, আমাদের ক্ষুধার পরিমাণ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা লুব্ধদৃষ্টিতে সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পাহাড়ের ভিতর এমন নির্ব্বান্ধব স্থানে বহুদিন এমন উপকরণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে কাহার বদন-কমল সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাও একবার চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমি ধর্ম্মজ্ঞান একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই; তাই জমীদার মহাশয়কে জানাইলাম, আমাদের মত মুসাফির লোকের এত অতিরিক্ত আটা, ডাইল, ঘৃতের কোন আবশ্যকতা নাই সুতরাং দোকানদার বেচারীর এত জিনিস নষ্ট করা যাইতে পারে না। কিন্তু জমীদার মহাশয় বলিলেন, আমাদের ন্যায় দুজন জোয়ান সাধুর জঠরাগ্নিতে কতখানি দ্রব্য পরিপাক হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন; তাই তিনি দুবেলার উপযুক্ত রসদ বাহির করিয়া দিয়াছেন। অপরাহ্নে যদি আমরা এই বাংলায় থাকি, তাহা হইলে ত আটা ঘৃত কাজে লাগিবেই; আর যদি নিতান্তই না থাকি, অর্থাৎ ছয় মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অপর ডাক বাংলায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা আবশ্যক হইবে; কারণ, সেখানে একখানিও দোকান নাই। সাধুর ভবিষ্যৎ ক্ষুধার চিন্তায় জমীদার মহাশয়কে আকুল দেখিয়া বড় হাসি আসিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই দুর্গম দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে কেহ আমার কম্বলে দুই সের সোণা বাঁধিয়া দিলেও তাহা আমি বহিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত নহি; আটা, ডাইল, ঘি, লবণ ত দূরের কথা। শুনিয়া জমীদার মহাশয় বলিলেন, পথে সোণা পাওয়া যায় না; কিন্তু দেহ ধারণের জন্য এ সকল দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক; এবং এ বিষয়ে

যখন আমাদের এত বিরাগ, তখন আমরা কখনও ভাল সাধু হইতে পারিব না; বিশেষতঃ তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবার জন্য যে সকল দ্রব্য মাপিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা পুনঃ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের নিকট পতিত হইতে পারেন না; অতএব তাঁহার অনুরোধ যেন অগ্রাহ্য না করি। অবশেষে আমি সেই অটা, ঘি, ডাইল, লঙ্কা ও লবণের মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বড় সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। আমার কথা শুনিয়া তিনি মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় কখন গৃহী ছিলেন না, গৃহীর দ্বারে সন্ন্যাসী বা সাধু আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করার পর গৃহীর প্রদত্ত দ্রব্যাদির দাম জিজ্ঞাসা করা কেবল গৃহীর অপমান করা নয়, তাহাতে আতিথ্যধর্ম্মও কলুষিত হয়। আমাদের আশীর্ব্বাদে সাধুসেবার এই সামান্য উপকরণের মূল্য প্রদানের সামর্থ্য আমার আছে, আর সামর্থ্য না থাকিলেও আমি ভিক্ষা করিয়া সেই মূল্য সংগ্রহ করিতাম।" হায় জননি বঙ্গভূমি! তোমার সুজল সুফল শস্যশ্যামল ক্রোড়ে বিলাস-পটু অপব্যয়ী জমীদার-পুঙ্গবগণের মধ্যে এমন সহৃদয় অতিথিবৎসল কয়-জন আছেন? আমরা সুশিক্ষিত, সুসভ্য, আলোকপ্রাপ্ত, আর ইহারা অশিক্ষিত, ঘোরমূর্খ, অসভ্য!!! এতদিন পরেও শিক্ষা সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিলাম না, সুতরাং নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলাম; জমীদার মহাশয়ের শেষ কথাটায় আমাকে বড় অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম, ভদ্রলোক আমার কথায় মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া, আমরা জমীদার মহাশয়কে আর এখানে বিলম্ব করিতে নিষেধ করিলাম, বিশেষতঃ তাঁহাকে অনেক-দূর যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার সঙ্গী পেয়াদা দুজনের মধ্যে একজনকে আমাদের 'রসুই উসুই বানানেকো লিয়ে' রাখিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে

লইয়া তাঁহার গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়েও, যাহাতে 'সাধু লোগোঁকো সেবা আচ্ছিতরে' হয়, তাহার জন্য পেয়াদাকে সাবধান করিতে ভুলিলেন না। দোকানদার দোকানে না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে দোকানের খবরদারি করিবার হুকুমও দান করিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য পদাতিকবর দুই জনের আহারোপযোগী আটা ভিজাইল। আমি বলিলাম, ও আর রাখিবার দরকার নাই, বিল্‌কুল্‌ আটা ভিজাইতে হইবে। সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মনিব সাধুকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া গেলেন, আর সে সামান্য ভৃত্য হইয়া সেই সাধু মহাত্মার কথার প্রতিবাদ করিবে, পাহাড়ী ভৃত্যের এত সাহস না থাকিলেও সে যাহা বুঝিল না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না। জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্ত আটা পাঁচ জনের খোরাক, এত আটা কেন ভিজাইব ?" আমি বলিলাম—"আমাদের খোরাকও অল্প নহে।" অগত্যা সে বেচারা সমস্ত আটা ভিজাইয়া লইল, ভিজাইতে ভিজাইতে দুই এক বার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দেহের প্রতি কটাক্ষ-পাত করিতেছিল। যে উদরে এত আটা, ডাইল, ঘৃত ও লবণের স্থান হইতে পারে, সে উদরের পরিধি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করাই বোধ হয় তাহার কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য।

আটা ভিজান শেষ হইলে, পেয়াদা সাহেব সাধু-সেবার জন্য দোকান হইতে দোকানীর থালা বর্ত্তন বাহির করিয়া আনিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের সৃষ্টি হইল—আটার পুরু পুরু রুটী, আর খোসাওয়ালা কড়াইয়ের ডাল; ঘৃত, লঙ্কা ও লবণ সংযোগে তাহা অমৃ-তের ন্যায় উপাদেয় হইয়া উঠিল; আমরা মহানন্দে যৎপরোনাস্তি পরি-তৃপ্তির সহিত ভোজনকার্য্য শেষ করিলাম, পেয়াদাও তাহার যথাযোগ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। আহারের সময় একবার ভগবানের

করুণার কথা মনে পড়িল; মনে হইল, তাঁহার কৃপায় কি না হইতে পারে? তাঁহার ইচ্ছায় মরুভূমিতে বারিবর্ষণ হইতে পারে, শশ্মানে কুসুম ফুটিতে পারে, জন্মান্ধের নয়ন উন্মীলিত হয়; এমন কি, জনমানবশূন্য খাদ্যসামগ্রী-লাভের সম্ভাবনা-বিরহিত সমুন্নত গিরি-বক্ষেও আটা, ঘি, ডা'ল, লবণ, লঙ্কা দিয়া মহাসমারোহে সন্ন্যাসি-ভোজন হইতে পারে—আজ ত তাহা প্রত্যক্ষই করিলাম। তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না, বিপদের মেঘে চারিদিকে সমাচ্ছন্ন দেখিলে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া বলি, "হে ভগবন্! তোমার বিচার নাই; আমার ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু নষ্ট না করিলে তোমার বিশ্ব নিয়ম কি ব্যর্থ হইয়া যাইত?"—হায়! "তাঁহারই দেওয়া সুখ, তাঁহারই দেওয়া দুঃখ" সমান সহিষ্ণুতার সহিত উপভোগ করিতে পারি না কেন?

আহারাদির পর গৃহপ্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া মনে মনে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, আর পার্শ্বশয়িত সঙ্গীটির বিকট নাসা-গর্জ্জন, তাঁহার উদরের পরিতৃপ্তি ও সুখসুপ্তির অকপট যুক্তি বহন করিয়া, আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অপরাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্গী স্বামিজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বামিজী বলিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?" আমি বলিলাম, "কর্ত্তব্য মহদাশ্রয়। জমীদার মহাশয়ের পাইক যখন আমাদিগকে ভরসা দিয়াছে, আর তিন মাইল চলিলেই তিহরীর রাজার আর একখানি বাংলা পদধূলির স্পর্শে পবিত্র করিতে পারিব, তখন আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ত কিছুই নাই। সমস্ত দিন এখানে কাটিল, আর ত এ স্থান ভাল লাগে না।"

স্বামিজীর বোধ করি, রাত্রিতে আহারের আবশ্যকতা ছিল না। তিনি যাত্রার নামটি না করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিলেন; বলিলেন, "তা বাপু, ভাল না লাগিলেও সমস্ত জীবনটা এই রকম করিয়াই

কাটাইতে হইবে। অদৃষ্ট ছাড়াইয়া ত আর পথ নাই। অদৃষ্টই যদি বশে রাখিতে পারিবে ত, সুখে থাকিতে এ রকম ভূতের কিলের রসাস্বাদন করিতে এ পথে আসিবে কেন ?"—আমি বলিলাম, "বৃদ্ধেরা যখন সামর্থ্য ও উৎসাহের অভাবে ক্রমাগত সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ প্রদান করেন, তখন যুবকেরা স্ব স্ব উন্মত্ত যৌবন ও অধীর আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তাহাতে তাহারা শান্তি না পাক্, সুখ পায় বটে ; আমি সে সুখে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না।"—আমি লাঠি ও কম্বল লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর কি বৃদ্ধ স্থির থাকিতে পারেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা উভয়েই পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথটির কিছু বিশেষত্ব দেখা গেল। পথের পার্শ্বে কোন দিকেও একখানি গ্রাম নাই, পথও পরিস্কৃত নহে, লতাগুল্ম জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া যেন পথের একটা অস্ফুট ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, অপরাহ্নের সূর্য্যালোকে সেই বক্র সঙ্কীর্ণ পথচ্ছায়াকে সেই পার্ব্বত্য বন্য প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্য পুষ্পমালার মৌনছায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্বামিজী সেই পথের উপর দিয়া নির্জ্জন সন্ধ্যার শ্রান্ত পথিকের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। গমনের সেই উদাসীন ভঙ্গি তাঁহার মত লোকের পক্ষেই সম্ভব। যিনি নিশ্চিত জানেন, সন্ধ্যার পর স্বগৃহসন্নিকটবর্ত্তী পান্থের ন্যায় তাঁহার আশ্রয় অবশ্যই মিলিবে, তিনি এমনই বিশ্বাসভরে, নিরুদ্বেগে চলিতে পারেন। যিনি ইহ সংসারের সর্ব্বস্ব পরম দেবতার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার করুণাকণামাত্রকেই ইহজীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিনের অন্তিম অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন, তিনিই এমন প্রসন্নমনে অব্যাকুলচিত্তে চলিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে সে বিশ্বাস, সে প্রসন্নতা, সে নির্ভর নাই, আমার কোন উদ্দেশ্যই নাই—তাই

আমি রুদ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলাম। কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে চলিব? সহিষ্ণুতা-লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়া আমি এই কয় বৎসর যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, আজও তেমনি চলিতে লাগিলাম। আমার অজ্ঞাতসারেই আমার গতির বৃদ্ধি হইল, স্বামিজী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন। তিনিও ডাকিলেন না, আমিও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বৃদ্ধ হয় ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, "স্নেহ-ডোরে যাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া বাঁধিয়াছি, সে পলাইবে কোথায়?"

হায়, বাঁধিলেই যদি আটকাইয়া রাখা যাইত!

আমার একটা লক্ষ্য ছিল, সন্ধ্যাকালে একটা আড্ডা চাই। সমস্ত জীবনটাই ত এইরকম এক আড্ডা হইতে আর এক আড্ডা পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছি। এক সময় আড্ডাকে সত্য ঘর-বাড়ী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। মানুষ দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ দূরদৃষ্টিহীন, একান্ত ঘটনাচক্রের দাস; সুতরাং হয় ত আবার এক দিন এইরকম আর এক আড্ডাকেও সুখের অনন্তকালস্থায়ী গিরি-দুর্গ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আড্ডা একটা বিশ্রাম-নিকেতন বলিয়াই মনে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর মুক্ত গিরিক্রোড়ে আমার জীর্ণ কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া শ্রমখিন্ন পদদ্বয়কে বিশ্রামদানের জন্য তাহার উপর পড়িতাম, আর আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে চাহিয়া বলিতাম,—

"পাপ-তিমির-চন্দ্র তপন, নাশ তাপ মোহ-স্বপন,
করহ প্রেমবীজ বপন, সিঞ্চি ভকতি-বারি।"

তখন মনে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, যে সুখ পাইয়াছি, স্নেহ ও মায়ার এই সহস্র বন্ধনে আর সে আনন্দ, সে সুখ, সে তৃপ্তি পাইলাম না।

পাশ্চাত্য দর্শনে বলে, "Life is earnest, life is real."—আমাদের শঙ্করাচার্য্যঠাকুর উপদেশ দান করিলেন, "নলিনী-দলদগতজলমতি-তরলং—তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" এই তর্কের মীমাংসা কোথায়? তুমি শত্রু-শোণিতে কাহারও সুখময়ী শান্তিময়ী জন্মভূমি কলঙ্কিত করিয়া বলিবে, "উহারা অসভ্য, আমরা উহাদিগকে সভ্য করিব"—আর আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরস্বরে বলিবে "Life is real, life is earnest"—এ তোমাদের খৃষ্টানী মত। আমাদের প্রাচ্য মত ঐ "তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" সত্যই ত জীবন অতি চপল; ক্ষণপ্রভার দীপ্তিবৎ চঞ্চল; এই সামান্য সময়টুকু ভূমানন্দ স্বামীর চরণপঙ্কজ ধ্যান কর। আমাদের এ মত ভ্রাতার বুকে ছুরী বিঁধাইয়া পিতৃরাজ্য অপহরণ করিবার কল্পনাও করে না; তথাপি সুখের যাহা আবরণমাত্র, তাহা-কেই প্রকৃত সুখের পদে বরণ করা তোমাদের জীবনের একটি মহৎ শিক্ষা।—কিন্তু যে সুখ প্রাচ্যমতে শ্রেষ্ঠ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার এ উদাসীন হৃদয় সংসারের মধ্যে কোথায় শান্তি লাভ করিবে?

তাই ত জীবনের অসারতার কথা চিন্তা করিতে করিতে নিতান্ত অসার লোকের মত কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসি-য়াছে, কেবলই 'বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে' দ্রুতবেগে চলিতেছি। এ পথের কি শেষ নাই? পৃথিবীর পথ ত এক দিন শেষ হয়, কিন্তু আজ এ একেবারে অনন্ত বোধ হইতেছে। সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের পল্লবে অন্ধকার বাঁধিয়া আমার মস্তকের উপর তাহা নত করিয়া ধরিল। আমি একবার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, পর্ব্বত-গাত্রে তিহরীরাজের বাংলা দেখিতে পাওয়া যায় কি না; কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে মরীচিকার মত তাহার একটা ছায়াও দেখিতে পাইলাম না। এক-বার ভয়চকিত নেত্রে দূরে চাহিলাম, পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গগুলি দূর হইতে

দূরে তরঙ্গিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর গোধূলির শেষ রৌদ্রচ্ছটা একটু স্বর্ণময় আভা অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে সন্ধ্যার ধূসর-ছায়ার লঘু রেখাপাত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম, গগনপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সে নীল সরোবরে একটা নক্ষত্র-কমলও তখন ফুটিয়া উঠে নাই।

সভয়ে পদতলে চাহিলাম, দেখিলাম, পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে—কে জানে, কোন্ ভীষণ জন্তুর গুহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া এ পথের শেষ হইবে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা হিংস্র জন্তু আছে, তাহা জানিতাম; বুঝিলাম—পথ ভুলিয়া আসিয়াছি! বুঝিলাম—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম—"তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"; এখান হইতে অদূরবর্ত্তী ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিতে যতখানি সময় লাগে, 'নলিনীদলগতজলম্' তাহা অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি নয়। দেখিলাম,—তর্ক অনুসারে জীবনটাকে পরিচালন করা যায় না। যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা দেবতা। তেমন দেবতা পৃথিবীতে কয়জন?

কিন্তু এ সকল তর্ক তখন মনে আসে নাই। তখন কোন্ দিকে পলায়ন করিলে অতি অল্প কালে দুর্জ্জনের স্থান পরিত্যাগ করিতে পারা যায়—সেই চাণক্যনীতিঘটিত যুক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

তাহার পর, যঃ পলায়তি স জীবতি"—পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যাঘ্রের কল্পনা আমার পদদ্বয়ে পবনের গতি প্রদান করিল। হঠাৎ মনে হইল—'স্বামিজী!—তাঁহাকে সেই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি! একটা ভয়ঙ্কর আত্মদ্রোহকর তিরস্কার মনের মধ্যে ভয়ানক প্রদাহ উপস্থিত করিল। সেই দুর্ব্বল, কৌশলজ্ঞান-হীন ধার্ম্মিক বৃদ্ধ এই অন্ধকারময় গিরিপথে একাকী প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না, বিপদ্ হইতে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে? মনে হইল—ভগবান্‌ই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমরা কেবল

মূঢ়তাবশতঃ নিজের অক্ষম চেষ্টাকে তাঁহার ঊর্দ্ধে স্থাপনপূর্ব্বক মানবীয় দাম্ভিকতার আদর্শ রক্ষা করি।

মন একটু শান্ত হইল বটে, কিন্তু উদ্বেগ একেবারে দূর হইল না। তাঁহাকে কাছে পাইবার জন্য একটা আকুলতা, আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল; বোধ হয় ইহা তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কায়। বীরত্বপ্রকাশের এমন শোচনীয় পরিণামের সম্ভাবনা—একবার কল্পনা করিলেও কি কখন এ পথে বীরদর্পে অগ্রসর হই?

বন্ বন্ করিয়া ছুটিতেছি। অন্ধকার ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সমান অন্ধকার—সূচিভেদ্য; বহুদূরে গিরি-অঙ্গে ওষধির উজ্জ্বল বিকাশ—অধিকাংশই লোহিত। আমার কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম, যেন মুক্তকেশী কালীর করাল মূর্ত্তি আমাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে—দিকে দিকে তাঁহার কেশরাশি উড্ডীন হইয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তৃতীয়নেত্রে ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। কে বলিবে, জগজ্জননীর এ সংহারমূর্ত্তি ভয়ঙ্করী নহে? একবার ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম—শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাহা হইতে স্বর্গীয় শান্তি ও করুণা ক্ষরিত হইতেছিল।

কিছু দূর ছুটিয়া যাই, আর এক একবার দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহি। দুই একবার ভ্রমও হইল; অগ্রসর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকি—"স্বামিজী!" স্বামিজী নিরুত্তর। শেষে সাবধানে হস্তপ্রয়োগ করিয়া দেখি—স্বামিজীর সুদীর্ঘ দাড়ী বলিয়া যাহা অনুভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখ-শোভার বৃদ্ধিকর শ্মশ্রুভার নহে, পার্ব্বত্য গুল্মের কণ্টকিত অগ্রভাগ! দৃষ্টিশক্তি দ্বারা কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বোধ করি ভৌতিক জগতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতারিত হয় নাই।

এইরূপে প্রতারিত হইতে হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে

যেন কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ দশহাত তফাতে কে বলিল—মনুষ্যকণ্ঠে—সুধাময় মনুষ্যকণ্ঠে বলিল, "কোন্ হ্যায়?"—স্বরে ভয়, সন্দেহ, উদ্বেগ কিছুই নাই, কিন্তু তাহা অসীমস্নেহে সিক্ত, করুণরসে আর্দ্র। যেন তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দৃষ্টি ছাড়াইয়া যাইতে পারি নাই। আমি স্বামিজীর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলাম,—বৃদ্ধের কি শান্তিপূর্ণ পুণ্যময় প্রগাঢ় আলিঙ্গন! বক্ষের চিন্তাগ্নিরাশির উপর ত্রিদিবের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইল।—দুজনে কোন কথা কহিতে পারিলাম না, আমি স্বীয় বাহুপাশে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সেই অন্ধকার পথের উপর দাঁড়াইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধের বাহুদ্বয় আমার স্কন্ধে স্থাপিত, তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু বহিয়া দুই তিন বিন্দু অশ্রু আমার উত্তপ্ত শ্রান্ত ললাটে নিপতিত হইল,—আমি এবার শিশুর ন্যায় অধীর হইয়া তাঁহার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলাম, তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "গাও 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা'।"

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া উন্মত্তের মত তাঁহার আদেশে কম্পিত কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলাম,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ;
এ সমুদ্র মাঝে আর, হ'ব না'ক পথহারা।"

পথ হারাইয়া পথ হারাইবার বিপদ্ উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারা যায় ; আমি তাহা অনুভব করিয়াছিলাম ; তাই আজ কাতরকণ্ঠে, সেই গিরিপ্রান্তে নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আকুল হৃদয়ে গানটি গাহিতে লাগিলাম। সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল, আমার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্তির সহিত তাহা গাহিতে লাগিল। ভাববিহ্বল স্বামিজী সেই লতা-গুল্ম-বিজড়িত পথের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। আমিও

তাঁহার ক্রোড়ের কাছে বসিয়া নৈশস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া হৃদয় ঢালিয়া গাহিতে লাগিলাম—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।"

গান শেষ হইলে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিশ্রামান্তে উঠিলাম। স্বামিজী বলিলেন, "কেমন বাপু, বিপদ্-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া কি-রকম সুখলাভ হয়, তাহার কিছু প্রমাণ পাইলে কি?" আমি বলিলাম, "যথেষ্ট; এই কষ্ট, ভয় ও যন্ত্রণা অপেক্ষা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা যাওয়া অধিকতর আরামজনক হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ আরামপূর্ণ জীবন জননী বন্য প্রকৃতির অনাবৃত বক্ষে ছুটিয়া আসিয়া সুখ দুঃখ আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে নাই।"

স্বামিজী বলিলেন যে, আমিই উৎসাহবশে পথ ভুলিয়া বিপথে গিয়া পড়িয়াছিলাম; শেষে তিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য অনেক ডাকিলেন, কিন্তু সে ডাক আর শুনিতে পাই নাই; বোধ হয়, তাঁহার কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। শেষে যখন মনে হইল, তখন, ভুল পথে পদার্পণের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম; পথের যেখানে সন্দেহ হইল, তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলাম—শেষে তাঁহাকে পাইলাম।—পথ একই কিন্তু মানুষের দাম্ভিকতা ক্রমাগত তাহাকে ঘুরাইয়া কেবল স্বকীয় অসা-রতা প্রতিপন্ন করে।

আমার যে পথ ভুল হইয়াছিল, তাহা স্বামিজী ঠিক বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। তাই তিনি আমার অবলম্বিত ভুল পথেরই অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছিলেন। আমার উদ্ধারের জন্য এমন জাগ্রৎ চেষ্টা, আর কখন দেখি নাই!

এবার স্বামিজীর প্রদর্শিত পথে চলিতেছিলাম। বুঝিলাম, যে পথে যাওয়া উচিত ছিল—এবং আমি ভ্রমক্রমে যে পথ এক পাশে ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছি—এ সেই পথ; বনু-গুল্মে সমাচ্ছন্ন হইলেও সম্পূর্ণ দুর্গম

নহে। অন্ততঃ বুঝিলাম, আমার আরণ্য-জন্তু-সমাকীর্ণ পথ অপেক্ষা এ পথ অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ।—সেই পথে চলিতেছি বটে, কিন্তু আর কত দূর চলিব? রাত্রি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে—পর্ব্বতদেহ ক্রমেই ভীষণতর ভাব প্রকাশ করিতেছে; কোন দিকে জনমানবের সংস্রব নাই; এমন কি, লোকালয় কতদূরে, তাহাও জানিবার উপায় নাই; যেন কোন পর্ব্বত-গুহাশায়ী পাষাণহৃদয় দৈত্যের কঠোর অভিশাপে পর্ব্বতস্থ জীবিত প্রাণি-সমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে—আমরা দুই জন বহুকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই প্রেতলোকে বিচরণ করিতেছি। নিজের নিঃসঙ্গতা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইল।—কিন্তু আর ত অগ্রসর হওয়া যায় না। অন্ধকারের মধ্যে কোন্ গুহায় পদদ্বয় পড়িবে, তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য ছিল না। নিরাশ হৃদয়ে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, একটি অনতিদীর্ঘ শাখাবহুল বৃক্ষ। স্বামিজীকে অঙ্গুলি প্রসা-রণে তাহা প্রদর্শন করিলাম এবং অগত্যা তাহারই স্কন্ধদেশে রাত্রিবাস করিব, মনে করিয়া, সেই বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইলাম। করস্পর্শ করিয়া দেখি—আঃ রাম, এ যে তিন দিকে দেওয়াল-বিশিষ্ট একখানি মৃৎকুটীর! ছাদ নাই, দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আমার নিকট অন্ধকারের মধ্যে বৃক্ষমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। দৃষ্টিশক্তির শোচনীয় অবস্থার কথা আর একবার স্মরণপথে উদিত হইল, কিন্তু মনে ক্ষোভ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল। এমন স্থানে এই রাত্রে যে বৃক্ষারোহণে রাত্রিযাপন করিতে হইল না, ইহাই আমাদের পক্ষে পরম সুখকর কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই গিরিপ্রান্তে ভগ্ন-প্রাচীরাবশিষ্ট কুটীর জীবনের আরামদায়ক অবলম্বন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইল, সত্যই মানব সামাজিক জীব। একখানি ভাঙ্গা কুটীরও তাহার পক্ষে এ নির্জ্জন গিরিপ্রদেশে যথেষ্ট সান্ত্বনার কারণ।

দেওয়ালের পাশে একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বামিজী বসিয়া পড়িলেন ; লম্বা সুরে বলিলেন, "বৃন্দাবনম্ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" —সে স্থান হইতে 'পাদমেকং' অগ্রসর হইবার আমারও ইচ্ছা ছিল না ; কম্বল বিছাইলাম। মাথার উপর সহস্র-নক্ষত্রদীপ্ত অনন্ত আকাশ, পদতলে সুকঠিন গিরিদেহ, তিন দিকে অনুচ্চ প্রাচীর, এক দিকে পার্ব্বত্য অরণ্য ; এইরূপ মহা সুখকর স্থানে রাত্রিজাগরণের সম্ভাবনায় স্বামিজী বিধাতার কৃপা স্মরণপূর্ব্বক ভাবে ভোর হইয়া পড়িলেন ; হাসিয়া বলিলেন, "আঃ, রাজার সিংহাসন কি ইহা অপেক্ষা পবিত্র, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বিকার, এমন আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ? গাও ত বাপু, ঐ কম্বলের ভিতর হইতেই ভগবৎ-প্রেমের একটা গান গাও। ' আজ সন্ন্যাসীর কামনার কিছু পরিচয় পাইয়াছি, তাহা প্রেম। সে প্রেমের নাম মনুষ্যের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। সে প্রেমে মিশিতে হইলে একেবারে জল হওয়া দরকার। গাও, প্রাণ ভরিয়া একবার ভগবানের প্রেমের গান শুনি।"

আমি আমার বন্ধুবর র—বাবুর রচিত একটি প্রেমের গান ধরিলাম —গিরি-কানন প্রতিধ্বনি তুলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিল—

"প্রেমে জল হয়ে যাও গ'লে,
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।

অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কলকল অবিরত, 'জয় জগদীশ' ব'লে ;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ 'পাড়ি ভাঙ্গ সমূলে,
চেয়োনা কোন কূলে, (শুধু) নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যা'রা, থাক্‌বে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে ;

(যারা) সাঁতার ভুলে নাম্‌তে পারে, (তাদের)

টেনে নে যাও একেবারে,

ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধুজলে।"

কতবার গাহিলাম, ক্রমে স্বর কমিয়া আসিল, শেষে পথশ্রমে তন্দ্রারও আবির্ভাব হইল। সেই হিমাচল-বক্ষস্থ অনাবৃত তৃণশয্যায় বিধাতার মঙ্গল-কিরণবর্ষী নত-নেত্রের ছায়ায় ধীরে ধীরে নিদ্রিত হইলাম—তখন বোধ হয় মধ্যরাত্র অতীত হইয়াছে।

আমার নিদ্রাটা কিছু নেপোলিয়ানী ধরণের; অশ্বপৃষ্ঠে খুঁটা না থাকায় অশ্বারোহণ-বিদ্যাটা আমার কাছে কিছু দুরূহ বোধ হয়, কাজেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নেপোলিয়ন কিরূপ আরামে ঘুমাইতেন, বলিতে পারি না, এই পাকা হাড়ে সে ইচ্ছাটাও বড় রাখি না; এই অনাবৃত স্থলে—পাহাড়ের মোলায়েম পিঠের উপর পড়িয়া—কম্বলের নীচে একখানি অতি নরম প্রস্তর স্থাপন করিয়া সুনিদ্রায় শ্রান্তি দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু নেপোলিয়ানী ঘুমের এই একটা মস্ত দোষ যে, অতি অল্পেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, আমার সে রাত্রে সুনিদ্রার বিশেষ সুবিধা হইল না। নিদ্রার উপাসনায় একটু সিদ্ধি লাভ করিতে না করিতে নিদ্রার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল; দেখিলাম, চার পাঁচটি লোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কলরব করিতে করিতে আমার মস্তকের নিকট অগ্রসর হইতেছে।—স্বামিজী তখন পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রাগত—যেন রাজপ্রাসাদের সুবর্ণময় পালঙ্কে বক-পক্ষ-শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছেন।

কিন্তু কি উৎপাত! লোকগুলার গণ্ডগোল যে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য মাথা তুলিলাম।—প্রথমটা কিছু ঠাহর করিকে পারিলাম না,—ডাকাতের দল নয় ত!—এ সাধু সন্ন্যাসীর পথে ডাকাতের উৎপাত থাকিবার ত কোনই প্রলোভন দেখিতেছি না।

তাহাদের উপর ডাকাতি করিলে লোটা-কম্বল, বড় জোর আধপোয়া তিন-ছটাক গাঁজা মিলিতে পারে ; তাহা ডাকাতির সামগ্রী নহে ; তবে অন্ধকারে লোকগুলাকে এক একটা কালো ভূতের মত দেখাইতেছিল বটে। সাধু—না সন্ন্যাসী—না আর কিছু—ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া হাঁকিলাম, "কোন্ হ্যায় ?"—আমার গ্রহ ! যদি আমি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে তাহারা বকিতে বকিতে সোজা চলিয়া যায় ; কিন্তু যেই আমি 'কোন্ হ্যায়' বলা—আর সেই মুহূর্ত্তে কে যেন তাহাদের উদ্গীর্ণ বাক্য-স্রোতের মুখে একখানি বিশমণ ভারি পাথর ফেলিয়া দিল। তাহারা একসঙ্গে সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার প্রশ্নটা পাল্টাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। আমি হিন্দুস্থানীতে বলিলাম, "আমি মুসাফির মনুষ্য। তিহরী যাইব, আপাততঃ এই রমণীয় স্থানে রাত্রিটুকু যাপন করিব, এইরূপ মনস্থ করিয়া কম্বল বিছাইয়াছি।" লোকগুলি বলিল, তাহারাও তিহরী হইতে আসিতেছে। বন্ধুত্ব-সংঘটনের এমন একটি সুযোগ তাহারা নষ্ট করিতে রাজী হইল না ; তাহাদের লটবহর লইয়া সেই খানে বসিয়া পড়িল ; এবং যে প্রকার বাদানুবাদ আরম্ভ করিল, তাহাতে মরা মানুষ জাগিয়া উঠে, সুতরাং স্বামিজীর যে নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ? স্বামিজী উঠিয়া বসিয়া তাহাদিগের পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন। পরিচয়ে জানিতে পারা গেল, তাহারা ভিন্ন গ্রামের লোক, তিহরীতে একটা মামলা করিতে গিয়াছিল। মামলার অবস্থা শুনিয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশের গৃহবিচ্ছেদের কথা মনে পড়িয়া গেল। মানুষের প্রকৃতি যে সর্ব্বত্রই একরূপ, তাহা অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিলাম। এক খুড়া ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র এই মামলায় বাদী প্রতিবাদী। আমরা যাহাদের কলকণ্ঠের ঝঙ্কার শুনিয়া আরাম উপভোগ করিতেছিলাম, সেটি ভ্রাতুষ্পুত্রের দল। এই দল মামলায় পরাজিত হইয়া মানসিক

কষ্ট ও অর্থব্যয়ের অনুতাপ, বাক্যে প্রকাশ করিয়া রাতারাতি বাড়ী ফিরিতেছিল। খুড়ার দল, শুনিলাম, সে দিন তিহরীতেই অবস্থান করিয়া, সেখানে কিছু পান-ভোজনের আয়োজন করিবে। মামলা জিতিয়াছে—সুতরাং ঘটা করিয়া আনন্দ প্রকাশ না করিলে আত্মপ্রসাদ পরিপূর্ণরূপে লাভ করা হইবে কিরূপে? যাহা হউক, ইহাদের এই গৃহবিচ্ছেদের বিষয়টি চির-পুরাতন। এজ্‌মালিভুক্ত একখণ্ড জমী লইয়া গৃহবিচ্ছেদ। খুড়া বলেন, ঐ জমী এজ্‌মালীর সম্পত্তিভুক্ত নহে; তিনি যখন পল্‌টনে চাকরী করিতেন, তখন টাকা জমাইয়া ঐ জমী ক্রয় করিয়াছিলেন। ভাইপো বলেন, ও সকল ঝুট্‌বাত্‌, ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার একটি ছল মাত্র। পৈতৃক বিষয়ের আয় হইতে ঐ জমী ক্রয় করা হয়; খুড়া বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন, তিনি পারিবারিক অর্থে নিজের সংস্থানটি বজায় করিয়া লইয়াছেন। পল্‌টনে চাকরী করিয়া তিনি কাজের 'লায়েক' হওয়াতেই তাঁহার উপর পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষার ভারার্পণ করা হয়; কিন্তু ভিতর ভিতর যে তিনি দুষমণি চা'ল চালিবেন, তাহা কে জানিত? ভাইপো আরও বলেন, খুড়ামহাশয় মাসিক 'ছয় রূপেয়া' তন্‌খা পাইতেন; তাহাতে কোন রকমে দুবেলা দুটি পেট চলিতে পারে, জমী কিনিবার জন্য কিছু সঞ্চয় করা অসম্ভব। কোন দিন একটি পয়সাও দেশে পাঠান নাই, বেতনের টাকায় চাকরী-স্থানেই নবাবী করিয়াছেন। মামলার সূত্রপাতের পূর্ব্বেই অন্ন পৃথক্ হইয়াছে। ভাইপোটির দেখিলাম খুড়ার উপর তেমন রাগ নাই, যতরাগ খুড়ার গৃহলক্ষ্মীর উপর; সে বলিল, "আমার খুড়া ভাল, খুড়ীই সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।" ভাইপোর মুখে শুনিলাম যে, হাকিম একটি গরু এবং তাহার পক্ষের উকিল একটি গাধা, উভয়ে মিলিয়া তাহাকে জেরবার করিয়াছে। তাহার হকের জিনিস হাত-ছাড়া হইল, এ আপশোষ

তাহার রাখিবার স্থান নাই। পরমেশ্বর ভবিষ্যতে সুবিচার করিবেন, ভাইপোর তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, শুনিতে পাইলাম; কিন্তু তথাপি তাহার আক্ষেপ নিবারিত হইল না, উপসংহারে সে তাহার হতভাগ্য নসিবের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজের পক্ষ সমর্থন করিল।

স্বামিজী বলিলেন, "তোমরা আদালতে গিয়া পাঁচ ভূতের পেট ভরাও কেন? আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে পার না?" ভাইপো বলিল, সে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা মধ্যস্থ হইবার যোগ্য লোক, তাহারা তাহার খুড়ার পক্ষপাতী; তাহাদের কাছে সুবিচার লাভের কোন আশা নাই দেখিয়াই আদালতে যাইতে হইয়াছিল।

অগত্যা স্বামিজী ধর্ম্মোপদেশের ছালা খুলিয়া বসিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই যে, খুড়া পিতৃতুল্য, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হয়, তাঁহার মনে কষ্ট দিতে নাই; এবং যদি তিনি কিছু অন্যায় বলেন, তাহা নতশিরে পালন করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সংসারের একমাত্র অবলম্বন, সামান্য অর্থের মোহে মুগ্ধ হওয়া অমানুষের কাজ, ইত্যাদি। একেই মামলা হারিয়া ভাইপোটির মেজাজ কিছু রুক্ষ হইয়াছিল, স্বামিজীর উপদেশে সে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।—সে বলিল, সাধু সন্ন্যাসীরা বিষয় কর্ম্মের কিছুই বোঝেন না, কেবল বাজে ধর্ম্মের কথা বলিয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইতে চেষ্টা করেন। এটা কলিযুগ; এ যুগে বাপ পর্য্যন্ত ছেলের গলায় ছুরী দেয়।—ভাইপো তবুও খুড়াকে খানিকটা শ্রদ্ধা করে; কিন্তু সে পিতৃব্যপত্নীকে কেন শ্রদ্ধা করিবে? সে ভারি ছোট লোকের মেয়ে—যদি তাহার খুড়ার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া আর কাহারও সঙ্গে বিবাহ হইত, তবে তাহাকে বাঁদিগিরি করিতে হইত। তাহার ছেলে-পিলে নাই; আছে এক ভাই; সে ভাইটিই তাহার মন্ত্রী, ভগিনীর সর্ব্বস্ব হস্তগত করিবার চেষ্টা সে সর্ব্বদাই করি-

তেছে, কিন্তু খুড়ীর দৃষ্টিশক্তি নাই। যাহা হউক, খুড়ার মৃত্যুর পর সে যে খুড়ার শ্যালককে কাণ ধরিয়া নেকাল দিয়া স্বয়ং সর্ব্বস্ব দখল করিবে, রাগের ঝোঁকে সে কথাটাও বলিতে ভুলিল না।

বক্তৃতা করিতে করিতে ভাইপোর দলের লোকের তামাকুর পিপাসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। একজন একটা চোঙ্গার মত লম্বা কলিকা বাহির করিয়া একটু তামাক সাজিল। এবং তাহাতে আগুনটুকু রীতিমত জমকাইয়া লইয়া কলিকাটি স্বামিজীর হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইল। স্বামিজী সবিনয়ে বলিলেন, তিনি তামাক খান না; ক্ষুণ্ণ হইয়া লোকটা আমার দিকে কলিকাটি বাড়াইয়া দিল, আমিও তাহাকে জানাইলাম, ও রসে আমিও বঞ্চিত। শুনিয়া লোকটা কলিকা হাতে লইয়া স্তম্ভিতভাবে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল, এমন অপরূপ সন্ন্যাসী তাহারা বোধ করি কখন দেখে নাই। একজন সবিনয়ে বলিল, আমাদের তামাকু খাইবার অভ্যাস নাই, কিন্তু গাঁজাটা বোধ হয় চলে; তবে দুঃখের বিষয়, আপাততঃ তাহার নিকট গাঁজা নাই; যদি আমরা একটু গাঁজা তাহাকে দিই, তাহা হইলে সে পরম আনন্দের সঙ্গে তাহা তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে। আমি বলিলাম—আমরা গাঁজাও খাই না। শুনিয়া ভাইপোর দল বিস্ময়ে কণ্টকিত হইল কি না, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না।—তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা যখন গাঁজা খাই না, তখন আমরা নিশ্চয়ই নকল সন্ন্যাসী; আমরা তাহাদিগকে কোন ধর্ম্মোপদেশ দান করিলে তাহারা তাহা আলুবৎ অগ্রাহ্য করিবে। এমন কি, এমন দুর্জ্জন প্রকৃতির নিকট দীর্ঘকাল বাস করাও ঝকমারি ভাবিয়া তাম্রকূট সেবন করিয়াই গন্তব্য পথে যাত্রা করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িল। ভাবিলাম—বাঁচা গেল!

খুড়া ভাইপোর মামলার বিবরণ শুনিতে শুনিতে পূর্ব্বদিক্ ফরসা

হইয়া আসিয়াছিল। ক্রমে পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ার ঊর্দ্ধে অরুণের স্বর্ণময় রথের ধ্বজা দেখিতে পাইলাম; ধূসর গিরি-অঙ্গে তখনও অন্ধকার নিদ্রাচ্ছন্ন, সুশীতল প্রভাত-বায়ুতে প্রভাত-বিহঙ্গের বন্দনাগীতি ভাসিয়া আসিতে লাগিল, বৃক্ষপত্রের শর শর কম্পনে বোধ হইতে লাগিল—সুনিদ্রার অবসানে তাহারা ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতার শিশিরাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আমাদের অপরিজ্ঞাত ভাষায় বিধাতার গুণ গান করিতেছে। এমন সময় স্বামিজী আমাকে যে চুপ করিয়া থাকিতে দিবেন, তাহা আমি আশা করি নাই; জনতা দূর হইলে কিছুকাল মৌনাবলম্বী থাকিয়া তিনি আমাকে কম্বলাবৃত অবস্থায় দীর্ঘশয়িত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু ঘুমোতে পেরেছ কি?"—আমি বলিলাম "আজ্ঞে না।"

"ভাব্‌ছো কি?"—"কিছু না, কাণ দুটো বড় জ্বালাতন হয়েছে, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্চি।" স্বামিজী বলিলেন, "প্রভাতকালে ওরকম ক'রে জিরুতে হয় না, একটা প্রভাতী গাও। ভগবানের নাম কর।"

আমি গলা শাণাইয়া লইয়া প্রভাতী ধরিলাম, আমাদের গ্রাম্য কবি কাঙ্গালের একটি অনুপম প্রভাতী আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই অর্দ্ধস্ফুট উষালোকে, সেই জনমানবশূন্য গিরিপ্রান্তে, সেই অনন্ত অম্বরতলে স্বামিজীর সম্মুখে বসিয়া আকুল প্রাণের সকল বাসনা ঢালিয়া দিয়া গাহিলাম,—

"ঘুমায়ো না আর, জাগ রে আমার মানস!
প্রভাত নিশি!
(দেখরে)
জ্ঞানচক্ষু প্রকাশি,
হয়ে একতান—
বিভুগুণ গাহিছে জগৎবাসী।

শোন ওরে মর্ত্তধাম! গাও রে নাম,
বলে পূর্ব্বদিক্ হাসি ;—
বৃক্ষ অগণন, অশ্রু বরিষণ,
করে প্রেমানন্দে ভাসি।
হৃদে আনন্দ না ধরে, প্রেমানন্দ-ভরে,
সুখ সুধাস্বরে প্রফুল্ল অন্তরে
পিতার নাম ধ'রে গুণ গান করে,
বিহঙ্গম বৃক্ষে বসি ;—
বিমল আকাশে, মহিমা প্রকাশে,
ভানু তনু প্রকাশি ;—
তুমি সচেতন হয়ে, অচেতনে রয়ে,
ভুলে আছ
পিতার গুণরাশি।"

গান শুনিয়া স্বামিজী মুগ্ধ, ভাব-বিহ্বল। গান-শেষে তিনি বলিলেন, "এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল! তা হচ্ছে না বাপু, আর একটা গাও, ভগবানের নাম-গানের এমন সময় আর পাবে না।"

আমি বিনা প্রতিবাদে ধরিলাম—

"একবার জাগ জাগ ভাই,
ভারত-সন্ততি!
অজ্ঞানে আবৃত, মায়া-শয্যাগত,
নিদ্রিত দশায়
কত কর স্থিতি।
মিছে কেন আর কল্পনা-দীপ জ্বাল,
ভারত-আঁধারে সত্যসূর্য্য উদয় হ'ল ;

উঠিল বিহঙ্গের ধ্বনি, মৃদঙ্গের ধ্বনি,
গাও মঙ্গলালয়ের
মঙ্গল আরতি।
তত্ত্বজ্ঞান-সত্য-দিবাকর-করে, মহা-ঘোর মোহ-অন্ধকারহরে,
ভুবন আকাশে, মহিমা প্রকাশে,
দেখ মঙ্গলময়ের মঙ্গল আরতি।"

তাই ত! একেবারে যে রোদ উঠিয়া পড়িয়াছে।—স্বামিজী বলিলেন, "ওঠ, আর বিলম্ব নয়, এখনি যাত্রা আরম্ভ করা যাক্।"

যাত্রা ত চিরদিনই আরম্ভ করিতেছি, এ যাত্রার শেষ হইবে কবে? কিন্তু আপাততঃ সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। লোটা কম্বল লইয়া উঠিতে হইল। যাত্রা শুভ ছিল, রোদ না পাকিতেই মাইল দুই আসিয়া তিহরীরাজের বাংলা পাওয়া গেল। দেখিলাম, খালি বাংলাখানি মরুভূমির মধ্যে একটা লক্ষীছাড়া খেজুর গাছের মত দাঁড়াইয়া আছে। স্থানটা ভয়ঙ্কর নির্জ্জন, চতুর্দ্দিক্ যেন নিদ্রিত বোধ হইতেছিল; মনে হইতেছিল, এ বুঝি কোন একটা মায়ার রাজ্য। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে এখনও মানুষ তৈয়ারী হয় নাই, অথচ প্রকৃতি-জননীর সৌন্দর্য্য পূর্ণবিকসিত। স্বামিজী বলিলেন, "এখনও সাতটার বেশী বেলা হয় নাই; এ সময়েও যদি এখানে বিশ্রাম করিতে বসি, তাহা হইলে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে পর্ব্বতসীমা অতিক্রম করা সম্ভব পর হইবে না।" স্বামীজির দেখিলাম, অতিশয়োক্তিতে একটু অনুরাগ আছে। এমনি করিয়াই চলিয়া ত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কে যাইতে চায়? কোথায় যাইব? জীবনের কি উদ্দেশ্য আছে? স্বামিজী একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন,—জীবনের যিনি মহান্ লক্ষ্য, তাঁহাকেই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন; আর আমি?—যাক সে কথা।

তিহরীর পথে।

তিহরীরাজের বাংলায় থাকা হইল না। বাংলা ছাড়িয়া চলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আজ মধ্যাহ্নে বিশিষ্ট আয়োজনের সঙ্গে একাদশীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেলা দশটা না বাজিতেই আকাশে যেন দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হইল। কি প্রাণান্তকর রৌদ্র! স্বামিজী সেই রৌদ্রে চলিতে চলিতে বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। আহা! বৃদ্ধের শ্রমখিন্ন দুর্ব্বল পা দু'খানি যেন আর চলে না। আমার অবস্থাও যে বিশেষ আশাপ্রদ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। অগত্যা আমরা একটি পার্ব্বত্য তরুর ছায়াশীতল মূলদেশে কম্বল প্রসারিত করিয়া বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিলাম। সেই মধ্যাহ্নটা পরিপূর্ণ অনশনেই বৃক্ষমূলে কাটিয়া গেল।

বেলা দুইটার পর সে স্থান হইতে উঠিলাম। স্বামিজী বলিলেন, "দেহ-রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ আহার করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তিহরীর পথ ছাড়িয়া আপাততঃ নিকটবর্ত্তী কোন লোকালয়ের পথই দেখা উচিত।" আমি বলিলাম, "সে হাঙ্গামায় আর কাজ নাই; আমাদের চলিতেই হইবে, সেইটিই প্রধান কাজ, আহারটি উপলক্ষ্য মাত্র; অতএব লক্ষ্য ছাড়িয়া উপলক্ষ্যের সন্ধানে ধাবিত হইবার আবশ্যকত নাই; এই পথেই দেখা যাউক, আহার যদি অদৃষ্টে থাকে ত দেখিব—মা অন্ন-পূর্ণা পথের কোথাও রুটির থালা সাজাইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন।"

স্বামিজী আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না। আমি যদি আহারের কষ্ট সহ্য করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যে নিজের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল নহেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

ঘণ্টাদুই চলিয়া বেলা চারিটা বা সাড়ে চারিটার সময় পথের ধারে একটি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। তরুপল্লব-বেষ্টিত ছায়াময় সেই গ্রাম-খানি দেখিয়া আমাদের চক্ষু যেন শীতল হইয়া আসিল। বড় রাস্তা

ছাড়িয়া সেই গ্রামের পথে প্রবেশ করিলাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম ত ভারি!—কতকগুলি ক্ষুদ্র কুটিরের সমষ্টিমাত্র। দুইটি সাধুকে সম্মুখে দেখিয়া সেই গ্রামের একদল লোক তাহাদের পর্ণ-কুটীর হইতে বাহির হইয়া আমাদিগের অভ্যর্থনা করিল। এক মণ্ডলের বাড়ীতে সে দিনের মত আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মণ্ডলের বিশেষ অনু-রোধে ও মণ্ডলানীর আগ্রহে আমরা রাত্রিটা তাহার কুটীরেই কাটাইয়া দিলাম। স্বামিজীর ধর্ম্মালোচনার উৎসাহ দেখিয়া বোধ হইল—সে রাত্রিটা তিনি জাগিয়াই কাটাইবেন। আমার সেরূপ উৎসাহ ছিল না, পূর্ব্বরাত্রে নিদ্রা হয় নাই, আমি এককোণে পড়িয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এক ঘুমেই রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে উঠিয়া মণ্ডলের নিকট বিদায় লইলাম, মণ্ডলের ছোট ছেলেটি সেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার ভারি বশ হইয়া পড়িয়াছিল; যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে একবার তাহার সন্ধান লইলাম, কিন্তু সে তখন ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইল না।—এত দিনে সে কত বড় হইয়াছে,—কিন্তু সেই শিশুর মধুর স্মৃতি এখনও আমার মনে আছে, আমার সন্ন্যাস-পথের মধ্যে এমন কত বালক বালি-কাকে একদিনের জন্য দেখিয়াছি—তাহাদিগকে আত্মীয়তা-বন্ধনে বাঁধি-য়াছি—কিন্তু তখনই তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে। জীবনটাই যেন আমার অভিশাপ। সংসারের কাহাকেও যে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, সে পথের ধারে পরের ছেলেমেয়েদের কি করিয়া নিজের করিয়া রাখিবে? যাহা হউক, সেই শিশুর স্নেহের স্মৃতিটুকু পাথেয় করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অরুণালোকে উদ্ভাসিত প্রভাতে পার্ব্বত্যপথে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম, এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তিহরী রাজধানীতে প্রবেশ করিলাম,—এই রাজপুরী আমার পরিচিত স্থান। এখানে আমার

বন্ধুবান্ধবও দুই পাঁচ জন আছেন ; সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টায় আমরা রাজ-বাড়ীর মহা-সম্মানিত অতিথিরূপে পরিগণিত হইলাম। সুদীর্ঘ দুই দিন কাল বিশ্রাম করিয়া এখানে আমরা যেমন আরামে থাকিলাম—তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা আমার নাই ; সন্ন্যাসীর জীবনে এমন ভোজন-সুখ দুই বৎসরেরও অধিক ঘটে নাই।